ভগিনী নিবেদিতা
ও
বাংলায় বিপ্লববাদ

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা-২৯ ॥ কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

বাংলার বিপ্লবে বিশ্বাসী
তরুণ ও তরুণীদের উদ্দেশ্যে
এই গ্রন্থটি উৎসর্গ
করিলাম।

কলিকাতা। ১৩৬৭ গ্রন্থকার॥

ভগিনী নিবেদিতা

(মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল : Miss Margaret Noble)

জন্ম—১৮৬৭, ২৮শে অক্টোবর (আল্‌স্টার, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড)

মৃত্যু—১৯১১, ১৩ই অক্টোবর (দার্জিলিং, বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ)

জীবনকাল—৪৩ বৎসর, ১১ মাস ১৫ দিন।

মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল : ২৮ বৎসর মাত্র যখন তাঁর বয়স, তখন লণ্ডনে (১৮৯৫, ১৫ই নভেম্বর) বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁর এই ২৮ বৎসর ১ মাসের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

ক. তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের মেয়ে, ইংল্যাণ্ডের নয়। তাঁর পিতা, স্যামুয়েল রিচ্‌মণ্ড্ নোব্‌ল—বিশেষতঃ তাঁহার পিতামহ রেভারেণ্ড (পাদরী)—আয়ার্ল্যাণ্ডকে ইংল্যাণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্ত বিপ্লবী মন লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন। জন্মস্বত্বে তিনি ইংরেজ-বিদ্বেষী এবং বিপ্লবী। তাঁর মাতার নাম, ইসাবেল নোব্‌ল।

খ. তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের পার্নেল ও রাশিয়ার প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্, এই উভয় বিপ্লবী দ্বারাই অতিমাত্রায় প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

গ. আয়ার্ল্যাণ্ডের কতকগুলি বিপ্লবের কেন্দ্র ইংল্যাণ্ডে, বিশেষতঃ লণ্ডনে ছিল। বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাতের সময় তিনি এই বিপ্লবের কেন্দ্রগুলিকে পরিচালিত করিতেছিলেন। আইরিশ সিন্ ফিন্, রাশিয়ার নিহিলিজ্‌ম্, এই উভয় মতের সংমিশ্রণে তাঁহার মানসিক বিকাশ পরিস্ফুট হইতেছিল।

ঘ. তিনি ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত হন নাই। দারিদ্র্যের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, এবং ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এই শিক্ষয়িত্রীর কার্যে তাঁহার মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল।

ঙ. তাঁহার দুইবার বিবাহের প্রস্তাব হয়। প্রথমবার (১৮[illegible]০) তাঁহার প্রণয়াস্পদ যুবকটির মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার, বিবাহে ইচ্ছুক যুবকটি সহসা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া (১৮৯৪) তাহার পূর্ব প্রণয়িনীকে

বিবাহ করে। এই ঘটনায় তিনি মনে খুব আঘাত পান। এবং ঠিক এই সময়েই বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

জীবনেতিহাসের এই প্রথম অধ্যায় আমি সবিস্তারে লিখি নাই। কারণ তাঁহার ফরাসী চরিতকার Lizelle Reymond ইহা অতি নিপুণভাবে সবিস্তারে লিখিয়াছেন। এবং তাহার বাংলা অনুবাদও হইয়াছে (নারায়ণী দেবী)। তাছাড়া, এই ২৮ বৎসর ১ মাসের জীবনের সহিত আমাদের দেশের যোগাযোগ বিশেষ কিছু নাই বলিলেই হয়।

আমার বন্ধু অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ. ভগিনী নিবেদিতার ফরাসী জীবনচরিত হইতে অনুবাদ করিয়া না দিলে, আমি এই গ্রন্থ লিখিতে পারিতাম না। তাঁহার নিকট সহস্রবার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মার্গারেটের পিতা পার্নেলের অধীনে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধাচরণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা ও পিতামহ ধর্মযাজক ছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আইরিশ বিপ্লবের মধ্যেই মার্গারেটের ছাত্রী-জীবন শেষ। পার্নেলের প্রভাব অরবিন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে প্রায় একই সময় সংক্রামিত হয়। পার্নেলের মৃত্যুতে (১৮৯১) অরবিন্দ কবিতা লিখিয়াছিলেন।

পার্নেলের নিয়মতান্ত্রিকতা হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পরে একাদিক্রমে ৪ বৎসর প্রিন্স ক্রপট্‌কিনের প্রভাবে আসিয়া নিবেদিতা সন্ত্রাসবাদ ও সশস্ত্র বিদ্রোহের দীক্ষা ও শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

নিবেদিতা যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে যাইয়াও প্রথমবারের মতই ব্যর্থমনোরথ হইয়া লণ্ডনে সশস্ত্র আইরিশ বিপ্লবের কেন্দ্রগুলির ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সময় (১৮৯৫, নভেম্বরে) বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহ-প্রস্তাব ভগ্ন হওয়াতে নিবেদিতা মনে খুব আঘাত পান এবং কিছুদিনের জন্য লণ্ডন হইতে হালিফ্যাক্‌স্ গিয়া মিস্ কলিন্‌সের (Miss Collins) সহিত বাস করেন। প্রথম বয়সে আজীবন কুমারী থাকিয়া ব্রহ্মচারিণী হইবার সংকল্প করেন নাই।

আমি বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতা (১৮৯৫—১৯০২) সাত আট বৎসর কোথায় কখন কতবার সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহা নিবেদিতার 'The

বিষয়		পৃষ্ঠা
অরবিন্দের গ্রেপ্তার (১৯০৮)	...	১৪৬
মাদ্রাস কংগ্রেস (১৯০৮)	...	১৪৯
লণ্ডনে সন্ত্রাসবাদ	...	১৫০
স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও বেলুড় মঠ	...	১৫১
মদনলাল ধিঙড়া	...	১৫২
শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মা	...	১৫৪
অরবিন্দ ও নিবেদিতা	...	১৫৬
নিবেদিতার বালিকাবিদ্যালয় ত্যাগ	...	১৫৮
অজন্তা (১৯০৯)	...	১৫৯
লাহোর কংগ্রেস (১৯০৯)	...	১৬১
রাজনৈতিক পরিস্থিতি	...	১৬২
অরবিন্দের নির্বাসন—বিভীষিকার ২য় ও ৩য় দফা	...	১৬৩
গোয়েন্দা আলম্ খুন (১৯১০)	...	১৬৩
নির্বাসিতের মুক্তি	...	১৬৪
নিবেদিতার পরামর্শ ও অরবিন্দের চন্দননগর প্রস্থান	...	১৬৫
চন্দননগরে অরবিন্দ (১৯১০)	...	১৬৬
অরবিন্দের প্রস্থানের পর নিবেদিতা	...	১৬৬
নিবেদিতার তীর্থভ্রমণ	...	১৬৭
১৯১০, জুলাই হইতে ডিসেম্বর	...	১৬৯
কংগ্রেস, ১৯১০—এলাহাবাদ	...	১৭১
নিবেদিতার আমেরিকায় গমন—মিসেস ওলে বুল্-এর মৃত্যু		১৭১
আন্তর্জাতিক কংগ্রেস (১৯১৮)	...	১৭৪
'ডন্' পত্রিকা (Dawn) (১৯১১)	...	১৭৫
নিবেদিতা ও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন	...	১৭৫
মৃত্যুপথযাত্রী নিবেদিতা—১৯১১	...	১৭৬
নিবেদিতার মৃত্যু—১৯১১, ১৩ই অক্টোবর	...	১৭৮
পরিশিষ্ট-সূচী	...	১৭৯
ভগিনী নিবেদিতা ও সভ্যজগতে নারীজাতির বর্তমান অবস্থা		১৮১

বিষয়		পৃষ্ঠা

GLEANINGS FROM NIVEDITA :

The Indian National Congress	...	১৮[illegible]
Footfalls of Indian History	...	১৯৫
The Web of Indian Life	...	১৯৭

A FEW TRIBUTES :

S. K. Ratcliffe	...	১৯[illegible]
Rabindranath Tagore	...	২০৫
Ramananda Chatterjee	...	২০৭
Prof. Patrick Geddes	...	২০৯
H. W. Nevinson	...	[illegible]

Master as I saw Him' গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। নিবেদিতা যাহা লিখিয়াছেন তদপেক্ষা বেশী কিছু বিস্তৃতভাবে লিখিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। বিশেষতঃ 'জয়শ্রী' পত্রিকায় * আমার 'নিবেদিতা' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবার কিছু পরেই 'The Master as I saw Him' গ্রন্থেরও বাংলা অনুবাদ 'উদ্বোধন' অফিস হইতে—ঐ সম্পর্কে আমার কটাক্ষের পর—প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার অন্য এক গ্রন্থে ('শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ') (—'বরোদায় চৌদ্দ বৎসর' অধ্যায়ে আমি বিবেকানন্দের সহিত নিবেদিতার কতবার কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাও বিস্তৃত লিখিয়াছি। এই দুই কারণের জন্য আমি বর্তমান গ্রন্থে উহার পুনরাবৃত্তি করি নাই।

বিবেকানন্দের নিকট শিক্ষা ও দীক্ষার সময় ('schooling under him') নিবেদিতা যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন তার মধ্যে— ক. ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় চিন্তার প্রভাব, ১৮৯৮, কলিকাতা স্টার থিয়েটার; খ. Kali—the Mother, কলিকাতা; গ. ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব, কলিকাতা—বিশেষভাবে স্মরণীয়।

নিবেদিতার 'Second period'এ দুইটি বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম, 'Kali—the Mother,' কলিকাতা; দ্বিতীয়, 'Indian Art', নিউ ইয়র্ক। এই দুইটি বক্তৃতাতেই নিবেদিতার উপর স্বামীজির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একজন খৃষ্টান মহিলার পক্ষে মা কালীর ভক্ত ও অনুরাগী হওয়া সহজ পরিবর্তন নয়। অদ্ভুত পরিবর্তন। ইহাতে স্বামীজির শিক্ষা ও প্রভাব বিদ্যমান। দ্বিতীয়—ভারতীয় আর্ট সম্পর্কে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে নিবেদিতার পরবর্তীকালের ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ স্বামী বিবেকানন্দ হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিল।

* 'জয়শ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ হইতেই আমি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' নাম দিয়া দুইটি বক্তৃতা দিয়াছি। এই গ্রন্থের জন্য সমগ্র পাঠ্যাংশের সম্যক পরিশীলন ও ক্রমসংস্কার করিয়া দিয়াছেন আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ (মণ্টি) ঘোষ। তাঁহারই উৎসাহে এবং 'জিজ্ঞাসা' প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী স্নেহাস্পদ শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের সর্বপ্রযত্ন তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই দ্বিতীয় অধ্যায় বিস্তৃতভাবে আমি এই জন্য লিখি নাই যে, 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা ইহা নিজেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমার সহপাঠী ও বন্ধু স্বামী মাধবানন্দ (বেলুড় মঠের বর্তমান সেক্রেটারী) ইহার বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত অবস্থায় বহু বৎসর ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি 'উদ্বোধন' অফিস হইতে সম্পূর্ণ বংলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাছাড়া, লিজেল্ রেমণ্ড-কৃত ফরাসী জীবনচরিতে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই দুই বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের অতিরিক্ত আমার কিছু লিখিবার নাই। বিশেষতঃ জীবনচরিত হিসাবে এই অধ্যায়ে নিবেদিতা-চরিত্রের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের তখনও বিচার বা প্রকাশ হয় নাই। তিনি তখন স্বামীজির নিকট শিক্ষার্থী মাত্র।

১১।১৩ কালীচরণ ঘোষ রোড, সিঁথি, কলিকাতা—২

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পূর্বে	...	১
স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর	...	৬
মিঃ ওকাকুরা ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৪
বরোদায় অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎকার	...	২৪
বেলুড় মঠের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ ; অরবিন্দের গুপ্তসমিতিতে যোগদান	...	৩৪
নিবেদিতা ও সরলা দেবী	...	৩৯
নিবেদিতা ও শ্রীগোখ্‌লে	...	৪১
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব	...	৪২
মাদ্রাসে কংগ্রেস—উগ্র রাজনীতি	...	৪৩
অরবিন্দের গুপ্তসমিতি কেন ভাঙ্গিল	...	৪৭
রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা (১৯০৪)	...	৪৮
রাজগৃহে নিবেদিতা (১৯০৪, অক্টোবর)	...	৫১
'দি ওয়েব্ অফ্ ইণ্ডিয়ান লাইফ্' (ভারতীয় জীবনজাল—১৯০৪)	...	৫৪
স্বদেশী যুগ	...	৫৬
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯০৫)	...	৫৮
লর্ড কার্জনের কনভোকেশন্ বক্তৃতা	...	৫৯
ডন্ সোসাইটি (১৯০২—০৬)	...	৬১
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব	...	৬৬
স্বদেশীর ধূমায়িত অবস্থা	...	৬৮
স্বদেশী যুগের প্রজ্বলিত অবস্থা	...	৭০
কাশী কংগ্রেসের জের	...	৮২
'যুগান্তর' পত্রিকা—মার্চ, ১৯০৬	...	৮৪
বরিশাল কন্‌ফারেন্স (এপ্রিল, ১৯০৬)	...	৮৬
'ফুলার' বধের চেষ্টা	...	৮৭
কলিকাতায় শিবাজী-উৎসব ও লোকমান্য তিলক	...	৮৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
বন্দেমাতরম্ পত্রিকা (১৯০৬)	...	৯২
বিপিন পাল সন্ত্রাসবাদের বিরোধী কেন ?	...	৯৫
অরবিন্দের কলিকাতা আগমন	...	৯৭
পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে নিবেদিতা	...	৯৯
নিবেদিতার পীড়া ও অবসাদ	...	১০২
কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেস (১৯০৬)	...	১০৩
কলিকাতা নৌরজী কংগ্রেসের পরে	...	১০৪
The Master as I saw Him	...	১০৬
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৮৭৮)	...	১০৮
নাগরিক জীবনের আদর্শ	...	১১২
ভগিনী নিবেদিতা ও 'মডার্ণ রিভিউ'	...	১১৬
নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ	...	১২২
কুমিল্লা ও জামালপুর (১৯০৭)	...	১২৩
অরবিন্দ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ	...	১২৪
বিপিন পালের মাদ্রাস বক্তৃতা	...	১২৬
লাজপত রায় ও অজিত সিং-এর নির্বাসন	...	১২৭
বেলুড় মঠের উৎসব	...	১২৮
যুগান্তরের মামলা	...	১২৯
ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রস্থান	...	১৩১
লণ্ডন (১৯০৭)	...	১৩২
আয়ার্লণ্ড (১৯০৮)	...	১৩৫
আমেরিকা (১৯০৮)	...	১৩৬
মাতার মৃত্যু	...	১৩৭
শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও মাদাম কামা	...	১৩৭
বিপিনচন্দ্র পাল ও 'স্বরাজ' পত্রিকা	...	১৩৮
কার্জন উইলি হত্যা (১৯০৯)	...	১৩৯
নিবেদিতার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯০৯)	...	১৪০
সুরত কংগ্রেস	...	১৪১

তখন হাহাকার বাতাস বইছিল। আকাশ নির্মেঘ। সকালের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রোদ্দুরে তাপ ছিল না। ঘাস মাটি ভিজে ছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই সব শুনশান। খরতাপ। মাটি থেকে ভেজা গন্ধটা কোন এক অদৃশ্য দৈত্য শুষে নিয়েছে। বোঝা যায় আকালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমুদ্র থেকে হাহাকার বাতাস উঠে আসছে। এবং এই অঞ্চলের মানুষজনের ওপর প্রচণ্ড রোষ। প্রকৃতি বিরূপ। তার উপর কিছুদিন ধরে সরকারী বাবুরা এসে শাসিয়ে যাচ্ছে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। যেখানে বাস ছিল, সেখানে ফিরে যেতে হবে। প্রায় বছর ধরে হুমকি আসছে। তার আগে বাবা বাছা করে দেখেছে ফল হয়নি। তখনই নিতাই শুনতে পেল, দূর থেকে কেউ ডাকছে। নদীর চরা থেকে কেউ হাঁক দিয়ে ওঠে আসছে। নিতাই বুঝতে পারল অভয় খুড়ো হাঁক পাড়ছে।

অভয় খুড়ো নদীর ওপার থেকে কোনো খবর নিয়ে আসতে পারে। নিতাই কুড়োলটা হাতে নিয়েই ছুট লাগাল। নতুন ঘর বাড়ি রাস্তা, কলাগাছ, পেঁপে গাছ, কেউ কেউ বাড়ির সামনে নারকেল গাছ পুতেছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সব গাছপালা বড় সজীব। মাটি উর্বরা হলে যা হয়। মা বসুন্ধরা আবাদহীন থাকলে যা হয়। মানুষের বাসের জন্য, জমি চাষের জন্য যেন প্রকৃতি বুক পেতে বসেই ছিল। জরা খরা আর মৃত্যু সম্বল করে পাহাড়ে পাথরে যারা ধুঁকছিল, এমন এক অকপট সজীব বনভূমির খবরে তারা স্থির থাকতে পারেনি। দলে দলে চলে আসছে। আর বন কেটে বসত বানাচ্ছে। সরকারী হুকুমের কেউ তোয়াক্কা করছে না। নিতাই যেতে যেতে সব দেখতে থাকল। বাবলি কাঠকুটো কোথেকে সংগ্রহ করে আনছে। মাথায় কাঠের বোঝা। ডুরে শাড়ি পরণে। নিতাইকে দেখতে পেয়েই চোখ মটকাল।—কোথা? কোনখানে যাও গোঁসাই!

নিতাই বলল, অভয় খুড়ো ডাকছে।

শুধু এ-ডাক যে নিতাই শুনেছে তা নয়। যারা ঘরে ছিল, যারা ঘরে ছিল না, সবাই যেন ডাকটা শুনতে পায়। তারপর অভয় খুড়ো রাস্তা থেকেই শহরের খবর, সরকারী বাবুদের হুমকির কথা বলতে থাকে।

এবং নদীর চরা থেকেই জটলা শুরু হয়ে যায়। যে যার ঘরে শেষে খবরটা পৌঁছে দেয়। রাতে টেমির আলোতে ভাত খায় পারসে মাছ দিয়ে। বৌ বেটিরা জোয়ান মানুষদের মুখে লক্ষ্য করে আতংকের ছাপ। নিজের দেশ এটা, ঘর বাড়ি করে, অনাবাদী জমি চাষ করে যখন লক্ষ্মী ঘরে প্রায় তুলে এনেছিল, তখনই হুমকি। জোর জুলুমের ভয় দেখাচ্ছে। জোয়ান মানুষেরা আগে এটাকে পাত্তা দেয়নি। শহরে কিছু বাবু ভোটের আগে এসে নির্ভয় দিয়ে গেছে। সম্বল বলতে এই শরীর। কালো, পাথুরে অঙ্গ। হাতে দা কুড়োল। পরে হাল গরু, ছাগল ভেড়া কিনে এনেছে। জমিতে আবাস গড়ে তুলতে গেলে যা যা মানুষের লাগে প্রায় সবই এসে গেছে। এখন মাইলের পর মাইল নতুন উপনিবেশ। উপনিবেশ গড়তে গেলেই প্রথমে খেতে লাগে। পরে জমি লাগে, শেষে চাষ আবাদ লাগে। মাথার উপর ছাউনি লাগে। ধার দেনা করে প্রথমে চিঁড়ে মুড়ি। পরে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া। চাই নৌকা। দিন যায় রাত যায়, করাতের শব্দ কানে আসে। মানুষ নিশুতি রাতেও জেগে থাকে। ঘুমায় না। কারণ নয়া আবাস গড়তে এসে বুঝেছে মানুষগুলো, হাতে সময় নেই। অনাবাদী ভূমির গর্ভে বীজ পুঁতে দিলে শস্য হবে, তার আগে জমির গাছমুড়ো সব সাফ করা দরকার। সেটা সময় লাগবে। সুতরাং কাঠ কাট, নদীর ও-পারে নিয়ে যাও, যা হয় চাল ডাল তেল নুন কেন। আর বাকিটা—নদী আছে, মাছ আছে, বাঁধ দাও, জল আটকাও, মাছের পোনা ফেল, দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে, তখন ধরণী সুজলা, সুফলা। তখন তারা সরকারের ঘরেই মাছ এবং শস্য তুলে দিয়ে আসতে পারবে। হাজার হাজার জোয়ান মদ্দ স্বপ্ন দেখছে, সরকার আকালে, মাছ, শস্যদানা

হাতে পেলে খুশি হবে। তখন আর হুমকি থাকবে না। বছরে পাঁচ সাত হাজার মণ মাছ, বিশ পঁচিশ হাজার মণ শস্য সরকারের ঘরে বাঁধা দরে বিক্রি করে আসতে পারবে। তাদের সাবলম্বী দেখতে পেলে সরকারের খুশি হবারই কথা। তারা ভাগিদার হতে চায় না, জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চায় না, যা অনাবাদি তাতে ফসল ফলিয়ে, মাছ জিইয়ে, জীবনে মানুষের মতো প্রতিষ্ঠা চায়। না, তারা আর কিছু চায় না।

অভয় খুড়োর পায়ে টায়ারের চটি, গায়ে তেল চিটচিটে একটা মার্কিণ কাপড়ের জামা। লম্বা ঢ্যাঙা মানুষ। চুল বড় বড়। ফকির বাউলের মতো মুখ চোখ। আগে একতারা সম্বল ছিল। এখানে এসে হাতে কুড়ুল নিয়েছে। আগে জমি আবাদ হোক, বন থেকে কাঠ কেটে আনা হোক, ঘরে ঘরে গাই গরু হোক, দুধ মাছ ফেনা ভাত হলে পরে আবার একতারা নিয়ে বসবে। কারণ বেঁচে থাকতে গেলে হাতে কুড়ুল চাই, হাতে একতাড়াও চাই। অভয় খুড়োকে না দেখলে সেটা বোঝা যায় না। সেই পাথুরে জমি থেকে বাস তুলে দেবার সময়, অভয় খুড়োই বুঝিয়েছিল, খাই না খাই, নিজের দেশ, নিজের চেনা জন মনিষ্যি গাছপালা আবাদ সব নিজের। মাটিতে পেট দিয়ে থাকতে পারলেও শান্তি। তখন ক্যাম্পের মানুষজন অভয় খুড়োকে দেবতার মতো ভেবেছে। যে যার লোটা কম্পল সম্বল করে পাড়ি দিতে লাগল। দেশের নেতা মানুষেরাও বলে এসেছে তাদের দল সরকারে এলেই ঘরের লোক ঘরে ফিরিয়ে নেবে। নিতাইর বাবা ছিল অভয় খুড়োর দোহার। সে বলেছিল, ঠাকুর যখন যাবেন ঠিক করেছেন, তখন আর কথা কি। ফি সালে খরা, চানা চুমরি খেয়ে পেটে কড়া পড়ে গেল। পাবদা মাছ মিলবে নি! কত কাল পাবদা মাছ দিয়ে ঝোলভাত খাইনা। নিতাই বাপের কথা শুনত আড়ালে। বাবা দেশ ঘরের কথা বলতে বলতে বড় আনমনা হয়ে যেত। কোথায় ছিল একটা নদী, তারপর বিশাল মাঠ, গাঁ-গঞ্জ, দুধালো গাই, পরবে ইলিশ মাছ আর রেণুপদ হালদারের জালে আড়কাঠি। সে-নাকি কতদিন যায়, মাস যায় কেবল নদীতে ভেসে

থাকা। বড় চাঁই মাছ আর শিলং বাটা মাছ, পারশে চাপিলা বজড়ি কত হরেক কিসিমের মাছই আছে। বাপের সেই দেশ নিতাই দেখেনি। তবু সে যেন দেখতে পায়, ঠাকুরবাপ এসে ডাকত নিশুতি রাতে। ও কিরনী জেগে আছনি। ওর ঠামা ধড়ফড় করে উঠে বসত। কুপি জ্বালিয়ে বুঝত, তার মানুষ নদী থেকে ফিরে এসেছে। বর্ষার নৌকা ঘাটে এসে লেগেছে। তখন পাড়া পড়শিরা খবর পেয়ে যেত। একটা বিশাল ডোঙ্গার মধ্যে মাছ সব খলবল করে বেড়াচ্ছে। রাতের জিড়ান দিয়েই ঠাকুরবাপ আবার নদীতে ভেসে পড়বে। ঠাকুরবাপের সঙ্গে নাড়ু জ্যাঠা, করিম মিঞা, আরও কত জনা। যে যাবে নদীতে তারা এসে নৌকায় উঠে পড়ত। বড় উত্তেজনা। নিতাইর বাপ সুরেন লাফিয়ে উঠে যেত ডোঙ্গায়। ঠাকুরবাপ ডাকত, হেই বাপরে, দেখবি নাকি। তারপরই সে পাটাতন তুলে দেখাত। ইয়ে মাছ। একখান বিশাল মাছ পেট উঁচিয়ে পড়ে আছে। বড় চাঁই মাছ। কী তাজা! রুপোর বরণ গা। ঠোঁট সিঁদুরের মতো লাল। শুড় ভাসিয়ে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। আর এই মাছ ধরার জন্য কত কিসিম করতে হয়েছে, ঠাকুরবাপ দশজনের কাছে তার গল্প বলে হুকা টানত।

নিতাই দৌড়ে যাচ্ছিল, আর ভাবছিল, অদ্দিষ্টে কিছুই থাকল না। কারা এটা করে। জমি থেকে কারা উচ্ছেদ করে দেয়! সে বড় হতে হতে বুঝেছে, আসলে জমি মানুষের সঙ্গে বেইমানি করে না। মানুষই বেইমান। না হলে করিম মিঞাই বলবে কেন, পরাণ দাদা অবস্থা ভাল বুঝতেছি না। লাগবে বোধ হয়।

কি লাগবে, কেন লাগবে?

বাপ সুরেন তখন বড়ই অবুঝ মানুষ। তবু বোঝে, ঠাকুর বাপ ত কারও সাতে পাঁচে থাকে না। খাটে খায়। বছরের পূজা পার্বণ সব ঠাকুর বাপ বড় ভক্তি ভরে করে। মানুষের জন্য ঠাকুর বাপ ঝড় জলে নৌকা ভাসায় নদীতে। হালদাররা জানে, পরাণ হালদার তাদের হল গে এক নম্বরের মাছ মারিয়ে। কোন নদীতে, কোন জুলায়, কোন স্রোতে

কি-মাছ ভেসে বেড়ায় ঠাকুর বাপের মতো কেউ বলতে পারে না! ঠাকুর বাপের ছিল বিশাল দেহ। এক দু-রাত এক নাগাড়ে অনায়াসে বৈঠা চালাতে তার মতো কে আর পারে! বিশাল বেড়িজাল ফেলে গহীন গাঙে ঠাকুর বাপ সাঁতরায়, আকাশে নক্ষত্র থাকে। ডুবে ডুবে বুঝতে পারে, জালের মাঝে কোন মাছের ঠোকর লাগছে। এবং এই এক নেশাই ছিল ঠাকুর বাপের বড় সম্বল। বড় নেশা। নিজেরটা বুঝত না। শুধু অভিযানে বের হয়ে পড়া। বিশাল নদীর গর্ভে অতল জলে সাঁতার কেটে কেটে এক মনুষ্য তারে কয় যারে যায় না ফেলা, যে শুধু মাছের রাজা হয়ে বাঁচতে চায়। তার সংসার চলে গেলেই সে খুশি। তারপর রাতে পালা কীর্তন। পাড়ার গুরুমশায় একতারা বাজিয়ে মঙ্গল চণ্ডির থানে গান গায়। ঠাকুর বাপ দোহার। পাড়া পড়শিরা টেমির আলো জেলে এসে বসে থাকে। আকাশে বাতাসে তখন এক সুরলহরী—যেন মানুষের পরিশ্রমের পর ঈশ্বর ভজনা না হলে চলে না।

সে সব দিন কবেকার কথা হয়ে গেছে। সে দৌড়াচ্ছিল। লোকজন দৌড়াচ্ছিল। অভয় খুড়োই সব খবর নিয়ে আসে। সরকারী বাবুদের খবর, কাগজের খবর। এই খবর সম্বল করে এরা কি করবে না করবে ঠিক করে নেয়। যেমন প্রথমেই খবর হয়েছিল, এই জমি ছেড়ে দিতে হবে। খবর হয়েছিল, এটাতে কোনো বিদেশী চক্রান্ত আছে। সরকারকে নাস্তানাবুদ করার জন্যই তলে তলে মানুষগুলির ভয়াবহ এই চক্রান্ত। কিন্তু নিতাই জানে, তারা এসেছে স্বদেশের মাটিতে। সেই গাছপালা, সেই জমিন, ধানখেত, আম-জাম নারকেলের গাছ, নদী অরণ্য সব তার, কবে কে যে রক্তের মধ্যে সেঁদিয়ে রেখেছিল,—সে বলতে, এই সব। মানুষেরা, যারা নতুন করে বসত বানাতে লেগে গেছে—তারা জানেও না, চক্রান্ত কি হতে পারে আবার। তারা এসেছে শেকড় মাটিতে পুঁতে দেবে বলে। যেন এতদিন পরগাছা হয়ে বেঁচেছিল—একটু জমি আর অরণ্য মিলে, সুমার আকাশের নিচে হাত পা মেলে দেবার এই সুযোগ। সরকারী খাস জমি, আবাদ হয় না, শুধু

গে ঁও আর গরানের জঙ্গল, আর আছে অসংখ্য খাড়ি নদী। বর্ষায় জল এলে মনে হয়, সেই এক শাপলা শালুকের দেশ। প্রাণে বান এসে যায়।

তখন অভয় খুড়ো চেঁচিয়ে বলল, নৌকা জলে ভাসাও।

এ-কথা কেন !

নদী ধরে কি শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসছে !

জটায়ু খুব ঘাড় বাঁকা লোক। পরনে লুঙ্গি। হাতে দা। সে দা ছাড়া কখনও হাঁটে না। বাঁশ পেলে কুপিয়ে আনা। ডালা কুলো তৈরি হয় ওর ঘরে। সেগুলো চালান যায় হাসনাবাদে। নদী ধরে সে ভেসে যায়। কোথায় যায় ক'দিনের জন্য। তারপরই দেখা যায়, জটায়ু আর তার স্যাঙ্গাতরা ফিরছে মুলি ব াঁশের মাচান নিয়ে। এক দিন দু দিনের পথ না। কেউ বলে দু মাসের পথ। এখানে এসেই তার তিনটে খেপ হয়ে গেছে। হোগলার বেড়া, গোলপাতার ছাউনি আর যা কিছু চাল চুলো সবই মুলি ব াঁশের। জটায়ু এটা নিজের কাজ ভেবে নিয়েছে। কম দামে কম পয়সায় সে তার মানুষজনদের কেবল বলে যায়, ঘর বানাও। বসে পড়। ট্রাকে করে যারা প্রথম দিকে আসছিল, সে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। আসলে এটা একটা স্বাধীনতার স্বাদের মতো কিছু। পেলে একবার যা হয়। আলাদা রাজত্ব বানিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। হাজার হাজার ঘর তুলে মানুষের বসবাসের বন্দোবস্ত করাই ছিল জটায়ুব একমাত্র কাজ। এতদিন শুধু তারা সরকারের প্রত্যাশায় ছিল। সরকার কাজ দেবে তবে করবে। বীজধান, সার, হালের বলদ সরকার দেবে তবে চাষ আবাদ। জমি রুখা হলে যা হয়—সরকার তল্পি-তল্পা উজাড় করে দিয়েও এদের নিবাসী করতে পারেনি। জটায়ু দাদা বলত, নিজের থেকে না হলে পরে কত দেবে তোমায়। ফলে এখানে এসে জটায়ুদার কাজই হয়েছে, ঘর বানাও। আবাদ কর।

অভয় খুড়ো জটায়ুদাদা মণীন্দ্র হালদার ঘুরে ঘুরে সব মানুষকে সাহস জুগিয়ে গেছে। সেই অভয় খুড়ো বলছে, জলে নাও ভাসাও।

নিতাই বুঝতে পারল না, কেন এ কথা? এবং আগুনের মতো

এই সব কথাবার্তা ছড়িয়ে যায়। এই কিছুদিন আগে সরকার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ওদের ভাতে মারতে চেয়েছিল। কোথাও থেকে কিছু আসবে না। রাস্তা ঘাট বন্ধ। নদী পারাপার বন্ধ।

পুলিশের ঝাঁক মৌমাছির মতো উড়তে থাকে। দু-একবার দাঙ্গাও হয়ে গেছে। ওদের এলাকায় জটায়ু আর ফিরে এল না। বাপ সুরেন আর ফিরে এল না।

এমনিতেই নতুন জায়গা হলে প্রথমে জল সয় না। যা খায় তাই বদহজম। ওলাওঠায় সাফ হয়েছে কিছু? ডাক্তার বদ্যি নদীর ও-পারে। সেখানে কেউ গেলেই সংশয়, কে হে বাপ, এখানে কি করতে! কি চাই, কথা বলাও যায় না মুখ খুলে। কত চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে এই লোকগুলির ভেতরে সব সময় কি হয় কি হয় ভাব। নিতাই জানে, বাইরের লোককে তারাও বিশ্বাস করে না। খবরের কাগজে সে শুনেছে রোজই খবর, ভাল খবর মন্দ খবর মিশে থাকে। যেমন একবার লেখা হয়েছে নাকি, এক অরণ্যভূমি সোনার জমিন হতে চলেছে। মাছের আর আকাল থাকবে না। লোনাজল ঢুকিয়ে বাঁধ বেঁধে মাছের চাষ করতে হয় কি-ভাবে এদের কাছে না গেলে শেখা যায় না।

নিতাই জানে, সেটা অবশ্য যথার্থ কথা। তার মাছমারিয়ের বংশ। মাইলের পর মাইল ধরে সব পড়শিরা মাটি কাটার কাজ করে গেছে। খাল কেটে জল নিয়ে এসেছে। লোনা জলে ভেটকি গলদা পারশে। সেই মাছ হাসনাবাদ গেছে। মাছ বিক্রি করে পয়সা আসছে। লোকেও খেতে পাচ্ছে। তারপর ভাগ। কেউ একা নয়। হাজার হাজার তারা একসঙ্গে, সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ। টেমির আলো যদি জ্বলে সব ঘরেই জ্বলবে, না জ্বললে কোথাও জ্বলবে না। এক বেলা খেলে সবাই খাবে, না হলে কেও খাবে না। শিশু বুড়োরা আগে তারপর জোয়ান মানুষেরা যা হয় কিছু খাবে।

নিতাইচরণ বিপ্লব জানে না। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মনে

হয়েছে, কিছু একটা হচ্ছে। কেউ তারা একা না হয়। এতগুলান মানুষের নসিব এক সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা। কাজেই ভয় নেই। খাটো খাও। রোদ্দুরে মাটি কোপাও। নৌকায় অরণ্যে চলে যাও। কাঠ কেটে আন। বেঁচ। তারপর চাল ডাল নুন আন। এনে ভাগ করে দাও। ইস্কুল বসাও। ক্লাব ঘর কর। একটু ঠাকুরের নাম নিতে হয়, আটচালা করে তাও পুষিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ নিতাইচরণ বোঝে না, সরকার কেন খাপ্পা দিন দিন।

বাপ পিতামোর ফেলে আসা দেশটার গল্প তার জানা। বাপ বলত, দেশ একদিন স্বাধীন হবে। কী ভয়। কী আশংকা। দাঙ্গার সময় কারু মনে সুখ নাই। কখন না জানি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। আর রাতে মুসলমান গাঁয়ে জিগির উঠলেই যে যার ঘরবাড়ি ফেলে জঙ্গলে চলে যেত। জঙ্গলে লুকিয়ে পড়তে হত। আর কেবল মনে হত, লোক আসছে অসংখ্য, অসংখ্য লোক আসছে, জিগির দিচ্ছে। হাতে মশাল, সড়কি বল্লম। এবং এসেও গেল একদিন। তারপর যে যার মতো ঘরবাড়ি ফেলে নিশুতি রাতে নদী সাঁতরে হেপারে উঠে সোজা বর্ডার পার হয়ে চলে আসা। তারপর ক্যাম্প আর ক্যাম্প। ঘরবাড়ি এখানে ওখানে উঠেছে একদিন। আবার সরকারী পরোয়ানায় ঘর ভেঙেছে। ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। ছাগল ভেড়ার মতো তুলে নিয়ে কোথায় যেন দিয়ে আসে তাদের। ট্রাকে করে কোথা থেকে কোথায় যেন পৌঁছে দিয়েছে তাদের।

নিতাইচরণ তার বিশ বাইশ বছরে কত কিছুর সাক্ষী। কেন এটা করে। কেন তাড়িয়ে বেড়ায়। দু মুঠো অন্ন, আশ্রয়, জল এবং জমি হলে তারা আর কিছু চায় না।

তখন চরে লোকজন জমে গেছে। অভয় খুড়ো ভিড়ের মধ্যেই হাত তুলে বলেছে, ঘাবড়াবা না। আমরা চোর ছ্যাচোর নই। খাটি খাই। কেউ আমাদের দু-পয়সা দিয়ে কয়নি, দিলাম। ভগমান সাক্ষী। যেন অভয় খুড়ো এইটুকু বলেই সবাইকে শংকার কথা জানিয়ে দিল।

গদন জ্যাঠা বলল, বলবাত কি হইছে? কি খবর!

—নৌকা ঠিক রাখ। পারত আরও জঙ্গলে ঢুকে যাও। গরমেণ্টের মতলব ভাল না।

কি করবে? এতগুলান মানুষের জান নেবে বলছ?

জান নিয়ে বেঁচে যেতে দাদা। তা কে নেয়। এই যে নিতাই-চরনের বাপ চলে গেল, তুমি আমি কিছু করতে পার্বছি। যে যায় সে বাঁচে।

ভিড়, হট্টগোল, নানা রকমের কথা কানে আসতে থাকে নিতাই-চরণের। সব জোয়ান মদ্দরা অভয় খুড়োকে ঘিরে রেখেছে। অভয় খুড়ো হাঁটলে ওরা হাঁটছে। অভয় খুড়ো দুটো কথা বলেই মাটিতে হাত ঠেকিয়ে মা বসুন্ধরাকে প্রনাম করছে। যেন সাক্ষী এই ধরনী, মা তোর ছেলে ঘরে ফিরে আইল, তারে ক্যান তাড়ায়। তোর ঘরে আমরা কি উপদ্রব করলাম মা জননী।

গদন জ্যাঠা বলল, সরকারী বাবুরা কি না করল! পুলিশ বসাল। চেকপোস্ট বানাল। ক্যাম্প বসিয়ে রেখেছে। চাল ডাল নুনের পথ আটকে দিল। ওষুধ পথ্যি কেড়ে নিল। কিছু আসতে দিল না। তারপরই হাউ হাউ করে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল গদন জ্যাঠা। তার সোমত্ত ছেলে কালীচরণ এক ফোটা ওষুধ পেল না। তাজা পোলাটা দাওয়ায় দাপিয়ে মরে গেল। —কে দেবে জবাব? গদন জ্যাঠার চোখ দুটো লাল। তখনই অভয় খুড়ো কেমন ধমকে উঠল, দাদা কার ঘরে সব ঠিক ঠাক আছে। দেশ থাইকা পালানের সময় যা আনছিলা আছে লগে। কার আছে কও। শুধাশুধি কান্দ ক্যান। যাইব। সব যাইব। তারপরই থেমে বলল, না যাইব না। কিছু না কিছু থাইকা যাইব। তার লড়ব।

আর কত আমাগ মারব।

কত মারব জানি না। সেটা ভগবানরে জিগাও।

আসলে এই সব মানুষের শেষ ভরসা ভগবান, নসিব। এখনই

কিছু কিছু লোক ভাবতে শুরু করেছে, জলে বাস করে কুমীরের লগে লড়াই হয় না। কেউ কেউ সময় থাকতে গা ঢাকা দিচ্ছে। যেমন জয়পুরের মাধু মণ্ডল তার বৌ পোলা নিয়ে নৌকা ভাসিয়ে চলে গেল। বলে গেল, কুটুম বাড়ি যাবে। সেই যে গেল আর এল না। মাধুর পরে কেষ্ট গেল। তারপর থেকে গত ক' মাসের মধ্যে একে একে অনেকে ভেগেছে। মনীন্দ্র আর অভয় ঘুরে ঘুরে বলেছে, এক আঁটির একটা লাঠি ভাঙলেও জোর কইমা যায়। তোমরা যাইয় না। গরমেণ্টের ক্ষমতা নাই, ওঠায়। এতগুলান লোককে ভাতে মারে কার সাধ্য আছে। আমাগ একটাই অপরাধ; আমরা খাইটা খাইতে চাই। তেনাগ দয়ার ওপর বাঁচতে চাই না।

গদন জ্যাঠা নেপলা গোপলা মাঝে মাঝে নদীর চরার দিকে তাকাচ্ছে। অভয় খুড়ো বলে চলেছে, সরকার নাকি প্পুলিশ দিয়া সব বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিব। গদন জ্যাঠা চিৎকার করে উঠল, কও কি!

নদীর ওপারে কানাঘুসা তাই শোনা গেল।

ভিড়টা কেমন হতবাক হয়ে থাকে। নিতাইচরন পাশে পাশে হাটছে। সামনের বসতিগুলির মেয়ে বৌরা খবরটা জানার জন্য রাস্তায় বের হয়ে পরেছে। সবার চোখে মুখে আতংক। কেউ আর রা করছে না।

এই প্রথম নিতাইচরন কথা বলল, খুড়ামশায় একটা কথা কই।

অভয় বলল, কও।

পালাইয়া আর যামু কোনখানে? তবে কি করবা? মরি বাঁচি লড়মু। বলে কুড়ালটা মাথার ওপর তুলে ধরল।

॥ দুই ॥

এভাবে নিতাইচরণ তিন পুরুষ ধরে তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। সে আকাশে বাতাশে কেমন কানাকানি শুনতে পায়। কে যেন বলে গেছে তাকে, হয়তো ঠাকুরবাপই হবে, ও আমি পরান হালদার কই, মাটির ক্ষুধা মানুষের বড় ক্ষুধা। যাও, তারে লও, তাবে সেবা কর। মা জননীর কোলে থাক, তারে সুজলা সুফলা করে রাখ। তার কোলে বাস, তার কোলে মরণ। তারে অবহেলা করতে নাই।

তাবপরই আকাশে বাতাসে যেন সে শুনতে পায় কোন এক অদৃশ্য আত্মা বিরাজ করে বেড়াচ্ছে। বিলাপের ভাষা সে বোঝে না। তবু তার মনে হয়, আসলে সেই যে কবে থেকে তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, খুন জখম হচ্ছে, ঠাকুর বাপ, তার বাপ, হয়ত সে নিজেও শেষ পর্যন্ত সেই এক কপাল করে এসেছে। জমি পেলেত অবহেলা করবে। সে জমিই পায়নি। তাকে বার বাব উৎখাত হতে হচ্ছে।

যেমন তার ঠাকুরবাপ পরাণের কথাই ধরা যাক। নিতাইচরণ শুনে শুনে যেমনটা জেনেছে—এই যেমন, গাধাগুলোকে সে রাতে আর জল দেখানো গেল না। গরুগুলি গোয়ালে হাম্বা হাম্বা করে ডাকছিল। এবং বাবুদের ঘোড়াগুলির চিৎকারে ধরা যাবে যে এই হত্যাকাণ্ড থেকে কেউ বাদ যাচ্ছে না। নিশুতি রাত। গাঁয়ের পর গাঁ দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিশুতি রাত। মাঠে মশালের আলো, মানুষের আর্তনাদ। কখনও পোড়ামাংসের চামসে গন্ধ আর এক হাহাকারের ছবি মাঠময় প্রেতের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। সকলেই পালাচ্ছে। গ্রাম উজাড় করে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পালাতে দিচ্ছে কে? তবু অন্ধকার মাঠের ভেতরে, ঘাস বন জঙ্গলের ভেতরে পালাবার জন্য ছুটছিল। কে কোথায় কোনদিকে ছুটছে হুঁস নেই, কে কখন আলগা হয়ে গেছে হুঁস

নেই। আসলে মরণের ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেলে যা হয়। নিতাই-চরণের ঠাকুর বাপ পরাণ হালদারও ছুটছিল। ছুটতে ছুটতেই মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে, ও কিরণী কোথায় গেলা। অ সুরেন, বাপ আমার, কোথা গেলি। ঠিক তখনই একদল অমানুষ, হাতে মশাল, সড়কি বল্লম—হল্লা জুড়ে দিছে, ঐ যায়। মার তারে। নিতাইর ঠাকুর বাপ প্রাণের ভয়ে মোত্রাঘাসের জঙ্গলে ডুইবে গেল। কেউ দেখল না। কাফের এক জঙ্গলে লুকায়ে রয়।

ঘাসের জঙ্গলে পরান ফের ফিস ফিস করে ডাকল, অ সুরেন, বাপ আমার কোথা গেলি। অ কিরণী তুই তর পোলা নিয়া কোন পগারে ডুব দিলি!

কোন জবাব পেল না। সবার পরাণে ডর। মরণে কামড় দিলে কার মাথা ঠিক থাকে। শুধু কোনরকমে এই নিশুতি রাতে জান নিয়ে পালানো। কিন্তু হায় পালানো বড় দায়—শহরে গঞ্জে উঠে যেতে পারলে রক্ষা। পরাণ তার বউ কিরণীকে বেটা সুরেনকে আর খুঁজে পেল না। মোত্রাঘাসের জঙ্গলে সে একা, আর একা বলেই বোধ হয় তার মিতা হাসিমের কথা মনে পড়ে গেল। জাবিদার কথা মনে পড়ে গেল। যদি তার মিতা জান রক্ষা করতে পারে। হাসিম ওর বড় আপনজন, বিপদে আপদে রক্ষা করে আসছে। সেই হাসিম যদি ওরে ক্ষয় করে দেয় তবে আর যাবেটা কোথায়? কিরণী যেতে পারে হাসিমের দরজায়। বেটা সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু তিন দিকে মশাল। মোত্রাঘাসের জঙ্গল পার হলে নদী। সে জলে ডুব দিতে পারে। ডুবে সাঁতার কাটতে পারে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত নদীতে ঝাঁপ দিল পরাণ। ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে ভেসে উঠল। হাসিমের বাড়ি উঠে ডাকল, একটা তফন দ্যাও আমারে মিতা। মুসলমানের মত টুপি পইরা চইলা যামু। অথবা যেন বলার ইচ্ছা ছিল, বনে জঙ্গলে কিরণীকে খুঁজে পাইনি হাসিম। তোর বাড়িতে বউ বেটার খোঁজে উঠে এলাম।

কে কথা কয়?

আমি পরাইন্যা। আমারে বাঁচা তুই। যদি মারতে ইচ্ছা যায় মাইরা ফ্যাল। আর পারি না।

দাঙ্গার সময় তখন। বড়ই অসময়। হাসিমের মত মানুষেরা একঘরে। জাবিদা দরজা বন্ধ করে বসেছিল। বলা যায় না, কে কখন এসে খবর নিয়ে যাবে, হাসিম গেছে উল্টা পথে। অসময়ে কে ডাকে! দরজা খুলে দেখল পরাণভাই। সে বলল, ভিতরে আসেন।

পরাণ দাঁড়াতে পারছিল না। সে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। ঘরে কুপি জ্বলছে। মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল। শীত বড় হিমেল বলে জাবিদা ঘরে আগুন জেলে দিয়েছে এবং ওরা পরস্পর ফিস ফিস করে কথা বলছিল। ভয়, কেউ শুনতে পাবে। সর্বত্র চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোক অন্ধকার মাঠে চোঙ মুখে এক-ঘরে লোকদের শাসাচ্ছে। আর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিচ্ছে। জ্বর জ্বালার মত এই ধম্মের অসুখ। যারে ধরে তারে খায়। মানুষ বড় অমানুষ হয়ে যায়। জাবিদার চোখে মুখে কাতর এক ভাব। আতঙ্কে পরান ভুল কথাব র্তা শুনছে।

সে বলল, কিঁরণী আমারে ডাকতাছে বইন।

জাবিদা বলল, ডাকুক। আপনের এখন বাইর হইয়া কাম নাই।

পরান কেমন শুনতে পায়নি মত বলল, কি কইতাছ বইন।

জাবিদা পরানকে সাহস দিল। বলল, আপনে অর ভকন পরেন, আগুন পোহান। আমি আইতেছি। বলে সে উঠানে নেমে পাশের ঘর বাড়িতে খোঁজ খবর নিতে গেল। কে কোথায় আছে, কার মনে কি মতলব। কে যেন এখন হেঁকে গেল, ইসমতালির পেটে সুপারির শলা ঢুকে গেছে। ইস্কুল বাড়িতে কিছু কাজের লোককে থাকতে দিয়েছিল ইসমতালি। বেটা মজা বোঝ। ইসমতালি রুখে দাঁড়িয়েছিল—শেষ পর্যন্ত পারেনি। গোটা ইস্কুল বাড়িতে আগুন, হল্লা। হাসিমও গেছিল সেখানে।

তখনই দেখল হাসিম দৌড়ে আসছে। অন্ধকারে মানুষ দৌড়ালে বোঝা যায় না। যেন জীবজন্তু দৌড়ায়। জাবিদা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘরে তার কাফের। কে জানে কোন মানুষ, কিন্তু কাছে আসতেই গায়ের গন্ধে টের পেল জাবিদা, হাসিম। অন্ধকার উঠোনে জাবিদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মেজাজ খাট্টা। —তুই আবার বাইরে ক্যান। ইসমতালির পেটে সুপারির শলা হান্দাইয়া দিছে।

জাবিদা বলল, পরাণ ভাই আইছে।

কেমন ছেলেমানুষের মত সে কেঁদে উঠল, পরাণ তুই বাঁইচা আছস!

পরাণ ভিতর থেকেই বলল, হ আছি। যাই নাই। কিরণীরে পাইতাছিনা। সুরেন কোনখানে যে গ্যাল। পরাণ হাসিমের স্থির চোখ দেখে সব বুঝতে পারছে। হাসিম ভাইও ভাল নাই। তার জন্য আবার না হাসিম বিপদে পড়ে। সে এতক্ষণে বুঝতে পারল, ইসমতাআলি যাদের ইস্কুল বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল, তারা সব পুড়ে মরেছে। সুরেন কিরণী যদি থাকে। সে হাউ হাউ করে কাঁদতে গিয়ে বুঝল, বড়ই অনুচিৎ কাজ হবে। হাসিম জাবিদার প্রাণ সংশয় হবে। সে যেমন উবু হয়ে বসেছিল, বসেই থাকল। একটা গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে লাগছে।

চারপাশে তখন সব চুপচাপ, নিঝুম। একটা কীট পতঙ্গ পর্যন্ত নড়ছে না। হাসিম জাবিদার কারো মুখে রা নেই। পরাণের মনে হল সে হাসিমের বিপদ ডেকে এনেছে। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, বইন যাই। মাঠে মাঠে নাইমা যাই। কে কখন আইসা খোঁজ-খবর নিব। তোমরা বিপদে পড়বা। এই বলে ছুটতে চাইলে হাসিম খপ করে হাতটা ধরে ফেলল। বলল, যাইবা কই? মাঠে? আমি ত মরি নাই। তারপর বিবির দিকে তাকাল। বিবি কি বলে! বিবি সাহস দিলে তার আর ডর নাই। বিবি য্যান বলল, তফন পরে টুপি

মাথায় পরাণ ভাই নাইমা যাইতে পারে মাঠে। ছদ্মবেশে শহরে উঠে গেলে ভয় নাই।

হাসিম ভাবল অন্যরকম। অঞ্চলের মানুষ পরাণ। মাছ মারিয়ে পরাণ হালদার। কে না চিনে! ধরা পইড়া যাইব।

জাবিদা আর কোন বুদ্ধি দিতে পারল না। মাঠে মাঠে অনেক দূর যেতে হয়। তারপর নদীর পাড় ধরে। সহসা জাবিদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সময় নাই। কেডা কখন আইসা পড়ব। কাফের লুকাইয়া রাখছে কিনা, কে জানে কারে কয় কাফের। জাবিদা বলল একটা বুদ্ধি মাথায় আইছে। মনে লয় যদি ভাইবা দেখতে পার।

হাসিম বলল ক' তোর কি বুদ্ধি।

জাবিদা বলল, নদীর পারে হাইটা যাও। তারপর নদীর পারে তুমি, জলে পরাণ ভাই। একখানা পাতিল সম্বল কইরা ভাইসা পড়তে হইব।

সেটা আবার তর কি বুদ্ধি হইল।

পাতিল মাথায় পরাণ ভাই। জলে মনে হইব পাতিল ভাইসা যায়। পাতিলের তলায় নাক ভাষাইয়া নদী পার হইলে কেমন হয়?

হাসিম বুঝতে পারল, নদীর জলে পরাণ, সঙ্গে একটা পাতিল। পাতিলটা জলের ওপর ভেসে যাবে। পাতিলের নিচে পরাণের মুখ। সাঁতার কাটতে শ্বাস নিতে তখন আর কষ্ট থাকবে না। নদীর পাড়ে পাড়ে হাসিম, কাঁধে বাঁশের লাঠি, ছোট এক পুঁটলী ঝুলবে চিড়ার। জামবাটিতে চিড়া ভিজিয়ে কোন ঝোপে অথবা বন বাদাড়ে খুদা পেলে পরাণকে খেতে দেবে। জাবিদার বুদ্ধি বড় পাকা। নদীর পাড়ের মানুষ বলেই জাবিদার বুদ্ধিটা বড় পছন্দ হয়ে গেল। নদীর জল সম্পর্কে, কচুরিপানা সম্পর্কে এবং কোন পাড়ে কি আছে সব জাবিদার টিয়া পাখির মত মুখস্থ।

গোয়াল থেকে হাসিম সামান্য দুধ দুয়ে নিল। জাবিদা শীতের

রাতে সেই দুধ গরম করে আর একবার বাড়ি গোপাট, অশ্বথ গাছ সব দেখে এসে বুঝল, এই সময়। নয়ত মশালের আলো নিয়ে যারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা টের পেয়ে যাবে। ফাঁক ফোঁকরে না ফসকে গেলে হবে না। জাবিদা দুধ দিল পরাণকে। পুঁটুলিতে চিড়া বেঁধে দিল। হাসিম সঙ্গে যাবে। সে নদী পার করে দিয়ে আসবে। গঞ্জের নৌকায় তুলে দিতে পারলে আরও রক্ষা। এই উপদ্রুত এলাকা পার হয়ে গেলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। তাড়া খেয়ে পরাণ তখন বর্ডার পার হয়ে যাবে। জাবিদার বড় কষ্ট হচ্ছিল। তার আর সুখ নাই। হাসিমের সুখ নাই। মানে মানে জান নিয়া পরাণ ভাই হেপারে গেলে জাবিদা বাঁচে।

আর পরাণ নদীর জলে পাতিলের নিচে মুখ রেখে, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য সময় সময় পাড়ে হাসিমের লাঠির শব্দ শুনে জলের ওপর ভেসে উঠবে, অথবা পাতিলের ভিতর মুখ রেখে গোপনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। ওর কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। নদীতে কি যায়, পাতিল ভাইস্যা যায়। কে জানবে, পাতিলের নিচে পরাণ আছে, পরাণের জান আছে। পরাণ পাতিল মাথায় গভীর জলে ভেসে পড়লে কেউ আর টের পাবে না।

জাবিদা হাসিমের দিকে একটা লাঠি আর পাতিল এগিয়ে দিল।

তখনও পরাণ কথা বলছে না। মাছ মারিয়ে পরাণ কেমন বোধবাস্থিহীন। উবু হয়ে বসে আছে। আর বিলাপের মত উচ্চারণ, আমার সুরিনডা বাঁইচা আছেত! কিরণী! অরা কোন দিকে গেল।

হাসিম বলল, ঠিক পার হইয়া যাইব! ভাইব না। আগে নিজের জান বাঁচাও। পরে দেখা যাইব। আমরা ত আছি। নেও উইঠা পড়। আল্লার নামে রওনা হই।

তখন ঘোড়াগুলোর আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। বাবুদের ঘোড়াগুলি জ্বলে গেছে, মরে গেছে। মানুষের মতো অশ্বও পুড়ে যায়। আর মাঝে মাঝে আকাশে বাতাসে ভীষণ জিগির—পিশাচের মত হাঁ করা

মুখ আর হাসিমের কথা, অ আল্লা তর নামে অরা কিডা করতাছে। চক্ষু মেইলা ভাখ।

তখনও পোড়া স্যাৎসাঁতে চামসে গন্ধ, মাঠে মাঠে, গোপাটের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। পাখ পাখালিরাও ভয়ে এ-দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। হাসিম চুপি চুপি তখন বাড়ি থেকে নেমে গেল। পেছনে পরাণ। তার পেছনে জাবিদা। পরাণকে শেষমেষ বলছে, ডর নাই। তাইন লগে আছে। লাঠি আছে। মাথার উপরে আল্লা আছে। ডর নাই। বৌদি আর সুরিনডা ঠিক হেপারে চইলা যাইব। পালাইছে যখন বাইচা যাইব।

হাসিম গোপাটে নেমেই বুঝল, পালানো কঠিন। যখন তখন উল্কার মত ছুটে আসছে মশাল। দৌড়ে যাচ্ছে। হাসিম হাঁকল, ডুব। পরাণ টুপ করে ঝোপের মধ্যে ডুবে গেল।

কেডা? অ হাসিম ভাই!

হরে মিঞা! শেষ কইরা দিলা সব?

দিলাম। কাফের থাকতে দিমু না।

ভাল করছ। কাফের থাকলে আল্লার গোসা হইব। আমিও মাঠে কাফের খুঁজতে বাইর হইছি। পাইলেই জবাই করমু।

॥ তিন ॥

নিতাইচরণ মানুষ হিসাবে খুব বেশী বাড় বাড়ন্ত। চুল বড় বড়। আলিসান জোয়ান। হাতের পেশী সবল। সে এক কোপে একটা ছোটখাট গাছের গুঁড়ি নামিয়ে দিতে পারে। তারা মাছ মারিয়ের জাত। রাজকন্যা সত্যবতীর বংশধর তারা।

নিরেট পাথুরে জমিতে হাল বসাতে না পারলে বাপ তাকে সেই গল্পটা বলত, তোর ঠাকুর বাপ একবার গহীন জলে ডুব দিল আর উঠেনা। নিতা খুড়ো বলল, গ্যালরে গ্যাল। আমার বয়স হয়নি নদীতে ঝাপ দি কি করে। বাপ মাছের সঙ্গে ডুব দিছে। হাতে কোচ একখান। এপার হেপার জল থৈ থৈ। বষাকাল। তল পাওয়া যায় না নদীর। সেই নদীতে তোর ঠাকুরবাপ ডুইবে গেল, ভেসে ওঠে না।

বাপের কথার ধরনেই ছিল, এক কথা বার বার ঘুরে এসে পড়ত। শেষ করত অন্য কথায়। — তারপর বুঝলি দেখি তোর ঠাকুর বাপ অনেক দূরে হাত তুইলা দিছে। নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। কাছে গিয়া দেখি, কে যেন বাপেরে জলের নিচে নামাইয়া দিতে চায়। বাপ কোন-রকমে কয়, ধর। ধরে তোলার আগেই আবার বাপ ডুবে গেল, দূরে গিয়ে ভেসে উঠল। বুঝি না, নৌকার লোকজন শেষে কি করে, আমার তখন ড্যাংগা বয়স। টের পাই, জলে মাছ, ডাঙ্গায় মানুষ। তোর ঠাকুরবাপ পারবে কেন! মাছে মানুষে লড়ালড়ি চলছে। তোর ঠাকুরবাপ আর যখন মাছটাকে কাহিল করে আনছে, বাপ জলে মাথা ভাসিয়ে দিছে, তখন বুঝলি নেতাই, সে ভাবা যায় না—নৌকার লাখান এক আলিসান সিংহদুয়ারী বোয়াল। তুই মানুষের মাথার সমান লম্বা। য্যান আস্ত আর একখান সোনা রুপার নাও। লাফায়। লেজের বাড়ি না, য্যান তিন মাল্লা নাওয়ের একখান বৈঠা —

নিতাই বুঝতে পারত বাপ বড় দুঃখে দেশের মহিমা গাইত।

সেও বাপের সঙ্গে তখন উরাট জমিতে জল নিয়ে যায়, জমির ঘাস বাছে। নিড়ান দেয়, ফাঁক ফোঁকরে পাঠশালায় যায়। বাপ জমিতে হাল দিতে গিয়ে বলত, সব পাথর নেতাই। এডা কি ছাশে আইলামরে বাপ। জল নাই, রুখা জমি, আবাদ হয় না, সালভর আকাশ পানে চোখ। গরম খুব, য্যান ধরনী জ্বলতাছে। মানুষ জ্বলতাছে। মানুষের পরাণ কি এত মাগনা। যেনে তেনে রুইয়ে দিলেই হল।

এই করে নিতাই বুঝত, তার বাপের নসিব মন্দ। ঠাকুর বাপ পালাচ্ছিল, বাপ পালাতে চায়। বাপের মন পড়ে আছে দেশের মাটিতে! কোজাগরি লক্ষ্মী পূজা হয়, ঠাকুর পুরুত সব আছে। নারকেলের নাড়ু হয় তিলেব তক্তি হয় — কিন্তু বাপের মন বড় কাতর। এ দ্যাশে টুনি ফুল নাই। টুনি ফুল না হলে কোজাগরি লক্ষ্মী পূজাই বিফলে যায়। বাপ তাকে নিয়ে যেত কোরাপুটের কলমি পাহাড়ে। সারা দিনমান ওরা ঝোপে খুঁজে বেড়াত টুনি ফুল। আর বাপ বলত, লায়েক, তোরে নিয়ে যাব সেই একখান দ্যাশে—অর্থাৎ সে বুঝতে পারে, বাপ তার শেকড় বাকড় এই উরাট জমিতে ঢুকিয়ে দিতে পারছে না। জল সার না পেলে যা হয়।

এবং বলত, বুঝলি, নদী নাই, নালা নাই বর্ষাকাল নাই, জল থৈ থৈ করে না। ধানের জমি নাই, ডুব দিয়া নদী পার হওয়ন যায় না। বিলের মাছ নাই। কি নিয়া থাকি। ফের বলত লায়েক হ'। তোরে নিয়া যামু একবার সেই দেশে। দেইখ্যা আসবি দ্যাশ কয় কারে একখান। ছয় ঋতু তের পার্বণ, তর মায় জানে স্থলপদ্ম ফুল কারে কয়।

তারপরই বলে, নিয়া আইছিলাম একখান ডাল। তুই যেবারে ভূমিষ্ঠ হইলি সেবারের কথা। জয়নগরের ব্রজেন শীল মশাই দ্যাশে গেছিলেন, কইলাম, পারেন ত আমের আঁটি, কাঁঠালের বীচি নিয়া আসবেন। আর একখান স্থলপদ্মের ডাল। তা নিয়া আইল। গোয়ালঘরের ছনছাতলায় আমি আর তর মায়—কোনখানে লাগান যায় ভাবতে লাগি। তা তর মায় কইল, যা একখান দ্যাশ বাঁইচা উঠুক ত। জমি সাফ কইরা গোবর সার দিয়া দুই চারদিন যত্ন আত্তি করা গেল। কিন্তু বাঁচাইতে পারলাম না। এই দ্যাশের মাটিতে বোঝলাম স্থলপদ্ম গাছ বাঁচে না। আনলাম একখান সোনামণি লতা। বাঁচাইতে পারলাম না। জঙ্গল আর পাথর হইয়া যায় সব। পারস ত, বড় হইলে দ্যাশের পোলা দ্যাশে ফিরা যাইস।

তারপরই নিতাই দেখেছে বাপের মুখ বড় করুণ। বড় বড় চোখে

তাকিয়ে আছে সব উরাট জমির দিকে। চাষ আবাদ হয় না। সেঁচের জল পেলে তাও কিছু হত। সেই এক সালে, মনে আছে, কি খরা, সারা বছর এক ফোঁটা জল নাই। সামনে যা জমি ছিল, সব শুকনো মরুভূমির মতো। মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। গোয়াল থেকে বাপ মঙ্গলাকে নিয়ে গেল হাটে। বেচে দিয়ে এল। সারদা পল্লীর সব মানুষ বলছে কি হবে! তার উপর আছে মাউলি। পূজা পাবণে, ফসল তোলার সময়, ছাগল গরু বাচ্চা দিলে স্থানীয় বাবু ভাইরা জোর করে মাউলি আদায় করে। না দিলে থাকতে দেয় কে? মঙ্গলাকে বেচে দিয়ে তার বাপ যা পেল, বাড়ি ফিরে মাউলি বিদায় দিতেই তা ফুরিয়ে গেল।

সেদিনের রোষের কথা নিতাইর এখনও মনে পড়ে। যেন বাপ পারলে সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দেয়। দেশে বিচার নাই। বিচারটা কে করবে! পুলিশ দফাদার থেকে প্রজেকটের বাবুরা সবাই এর ভাগ পায়। বাপ চিৎকার করে বলেছিল নিতাইকে, মানুষের অধম্য দেখে শিখে রাখ বাপ, জীবন কারে কয়। বাপ তারপরও উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। মানুষ বলতে দু'জন। সে আর তার বাপ। পাড়াপড়শিরা সবাই বলাবলি করছিল, এখানে আর থাকন যাইব না।

বাবলির ঠাকুরবাপ পরাশর লাঠি ভর করে এয়েছিল! এক মুখ দাড়ি, চুল সাদা। কংকালসার মানুষ। চোখ কোটরাগত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকছিল, সুরিনডারে।

বাপ বাইরে বের হয়ে বলেছিল, পরা দা?

আইলাম তর কাছে!

বাপ জানে, কিজন্য এয়েছে। এক খুড়ি জল চাইল। জলের বড় আকাল। টিউকলে জল নাই। এক-ঘড়া জল বাপ সাঁঝে বের হয়ে গিয়ে রাত দুপুরে নিয়ে আসে। এইটুকু সম্বল, কেউ সহজে হাত ছাড়া করতে চায় না। অথর্ব মানুষ জ্যাঠা। বাবলি ছেঁড়া ফ্রক গায়ে দিয়ে দাওয়ায় বসে আছে ঠিক।

ক্যান আইলেন ?

যামু গিয়া ভাবছি।

বাপের কাছে এটা নতুন খবর নয়। সারদা পল্লীর অনেকেই গাঁ ছাড়া হচ্ছে। পরাশর জ্যাঠা এয়েছিল, দু' গণ্ডা ছেলেপিলে নিয়ে। খরায় জরায় সব উজাড়। যেমন বাড়বাড়ন্ত থাকে বৃক্ষ, বয়স হলে ন্যাড়া গাছ হয়ে যায়, তেমনি ন্যাড়া হয়ে গেছে পরাশর জ্যাঠা।

বাপ দাওয়ায় চাটাই পেতে দিল। অন্যদিন হলে কিছুই বলত না। থাকলে এক খুড়ি জল দিত। না থাকলে বলত, নাই। জল নিয়া বাপ মিছা কথা কয় না। আর কখনও বাপের মতিগতি ভাল থাকলে, জ্যাঠাকে বাবলিকে খেতেও দিত। সেদিন একেবারে অন্যরকমের। বাপের বুঝি একা হয়ে যাওয়ার ভয়।

মাইয়াডা থাকল।

বাবা বলল, কন কি !

হ কই। পোড়া ছ্যাশে মানুষ থাকে না। শহরে গঞ্জে যামু গিয়া। হাত পাতলে কিছু পাওয়া যাইব।

বাপের ভেতরটা ভয়ে কেমন কাঠ হয়ে গেল। কি মানুষ, কি হয়ে গেল ! এই রুখা জমিতে বাড়ি ঘর করার সময় জ্যাঠার নাকি বড়ই উৎসাহ ছিল। মানুষ কি না পারে। রুখা জমি ঠেলায় পড়লে বাপ বাপ বলবে। শস্যদানা না দিয়ে যাবে কোথায় ? মানুষের ঘাম বলে কথা ! এবং এই উরাট মাঠে, জ্যাঠার শক্ত দু' হাত বড় বেশি খাবলা খাবলি করেছিল। দিনমান আগাছা সাফ, শুকিয়ে গেলে আগুন দেওয়া। তখনও সরকার ক্যাস ডোল দিচ্ছে। গম দিচ্ছে। সবাইরে নিয়ে বড় জলাশয় বানাবার জন্য জমি খোঁড়া। সবতাতেই পরাশর জ্যাঠার হাঁক শোনা যেত। —হাই।

কেউ বসে থাকতে পারত না। পাথুরে উরাট জমি বছর দু' বছর সোনা ঢেলে দিল। ঘরে ঘরে তখন ফসল উঠছে। মাথায় করে আনছে শস্য। উঠোনে গাদা মারা শস্য দানা। সর্বত্র যব গমের গন্ধ

ম ম করছে। পরাশর জ্যাঠা একখান বড় লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। সকালে বউ বেটি বাদে কেউ ঘরে থাকতে পায় না। জমি চাষ কর জঙ্গল সাফ কর। সরকার তোমার ঘরের মাগ না। বিনি মাগনায় খেতে দেবে। কারণ পরাশর জ্যাঠার কাছে মানুষের পরগাছা হয়ে থাকার মত পাপ আর কিছু নাই! পরাশর জ্যাঠা ঘুরে ঘুরে দেখত, বাঁশ কাটার শব্দ আসত। বাড়ি ঘর বানাবার জন্য কোথায়, কি পাওয়া যাবে, পরাশর জ্যাঠাই বাতলে দিত। ঘরের মাপ মত কি বাঁশ কি শণ, কত দড়িদড়া লাগবে পরাশর জ্যাঠার চেয়ে কেউ বেশি জানত না। আর পরাশর জ্যাঠা রাতে গাছতলায় বসে দেহতত্ত্বের একখানা গান গলা ছেড়ে গাইলে সারদা পল্লীর মানুষজনেরা বুঝতে পারত, এই মাটি যথার্থ ই মানুষের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সেই পরাশর জ্যাঠা বলছে, যাম্ গিয়া।

আসলে সরকার ভেবেছিল, জঙ্গল সাফ করে মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে গেলেই দায় সারা। মানুষগুলি খাটতে জানে। তারপরও কিছু করার থাকে। রোগে অষুধ, খরায় জল, এবং বোঝা যায়, এখানে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এতদিন যে এখানে কোন বসতি গড়ে ওঠেনি, তাও এই জঙ্গলে আগাছা পাথুরে জমির মধ্যে কোন অলক্ষ্মীর বাস ছিল নিশ্চয়। বছর দুই যেতেই মানুষজনেরা টের পেল, আসলে এখানে অলক্ষ্মীর বাস। মানুষের ঘামের কোন দাম প্রকৃতি দেয় না। বড় নিষ্ঠুর। দূরের বনাঞ্চলে মাঝে মাঝে কেমন এক গভীর আর্তনাদ ওঠে। ওরা বুঝতে পারে মানুষ পথ হারিয়েছে। দু' তিন বছর বাদেই পল্লীর মানুষজন টের পেল তারা আবার 'পথ হারিয়েছে' এই পথ হারিয়েও তারা হাল ছাড়েনি। বার চোদ্দ বছর ধরে পথটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। করতে গিয়ে পরাশর জ্যাঠা একটা ন্যাড়া গাছ হয়ে গেল।

ঘরে ফিরেই উঠোনে কুড়োলটা ছুঁড়ে মারল নিতাই। পরনে কাল হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। শক্ত মজবুত শরীর। কালো কষ্টিপাথরের রঙ। চোখ দুটো বড় বড় সারা মুখে চোখ দুটো

বড় মাছের রূপোলি আঁশ যেন। চোখ তুলে তাকালেই চক চক করে। বাবলি, খোলা আকাশের নিচে কাঠ-কুটো গুঁজে দিচ্ছে। এক হাতে ঘরের সব করে। বাবলিকে পরাশর জ্যাঠা শেষ পর্যন্ত ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সেদিন থেকেই নিতাইর বড় মায়া পড়ে গেছে। মেয়েটাকে বাপ কোলে তুলে নিয়ে এসেছিল। সাহস দিয়েছিল। জ্যাঠা নাই বলে কি আর মানুষ নাই। নিতাই বন-জঙ্গল ঢুঁড়ে ফলপাকুড় নিয়ে এসেছিল। বাবলি দাওয়ায় বসে তখন মুড়ি খাচ্ছে। কলাই করা বাটিতে মুড়ি, এনামেলের গেলাসে জল। বাপ বলেছিল, নেতাই, তোর জ্যাঠা পালাইছে। মাইয়াটারে কে ছাখে। আর যা সময়কাল, ইজ্জত নিয়ে বড় টানাটানি চলছে। বাবলির মাটা আকালে খেতে পেত না। পাথর কাটা লোকের সঙ্গে ভেগে গেল একদিন। পরাশর জ্যাঠা চোখে চোখে রেখেও বাবলির মাকে ঘরে রাখতে পারল না। বাপের বোধ হয় কষ্ট উপজিল। মেয়েটার না আবার মন্দগতি হয়। দেশের মানুষজনের মন্দগতি হলে বাপ বড় কষ্ট পায়। বাপ ঘরবাড়ি সব বিচে দিয়ে তাকে আর বাবলিকে সার করে চলে এয়েছিল। বাবলি তখন বড় হয়ে গেছে। সেও বড় হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই সে আর বাবলিকে নিয়ে তখন বনবাদাড়ে ঘুরতে পারত না। আকাশের নিচে খোলা মাঠে ছুটতে পারত না। বাপের বড় ইচ্ছে ছিল, বাবলিকে আর একটুকুন বড় হলে, যোয়ান মরদ দেখে শাঁখা সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দেবে। সেই বাপকেও তার গেল শীতে জঙ্গলে কারা খুন করে রেখে গেল।

আসলে এ-ভাবেই মানুষের রোষ বাড়ে। চোখ জ্বলছিল। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে যাবেটা কোথায়! বাবলি ত কিছু বোঝে না। নিতাই আছে তার। এই যে কাঠকুটো ঠেলে দিচ্ছে, সেদ্ধ ভাতের গন্ধ বের হচ্ছে, এই যেন সে শুধু জানে। মানুষের আহার নিমিত্ত তার সুখ। সে আর বড় কিছু চায় না। সে আশা করেছিল, বাবলি তাকে দুটো একটা প্রশ্ন করবে। চরার

দিকে ছুইট্টে গেলে কেন? অভয় খুড়ো কি কইতাছে? কোন প্রশ্ন না!

কাঠের হাতা দিয়ে ভাত তুলে দেখছে। একবার শুধু বলল, সান-টান করবা না গোঁসাই! বেলা কম হয় নাই।

নিতাই তখনও দাওয়ায় হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে। কিছু বলছে না। বাবলি কি জানে, এই তার কপাল। চৌদ্দ পনের বছরের বাবলি যা দেখেছে, তার ফলে কি বাবলি এমনটা হয়ে গেল। যান কোন খবরই না এটা। এই করেই ত চলতাছে। যা-কদিন আছে মানুষের নিমিত্ত আহার, আগে থাকতেই আহারে বিঘ্ন ঘটিয়ে কি হবে। শেষ পর্যন্ত নিতাই আর না পেরে বলল, বাবলি তব পাকের হাতখানা এবারে ওঠা। শুনছসনি!

বাবলি হাঁড়ি নামিয়ে রাখল মাটির পৈঠাতে। মালসায় ঢেকে ফ্যান গালতে থাকল। ডুবে শাড়ির আঁচল উড়ে আঁখায় পড়ছিল। তা সামলে নিল। আঁখার আগুনের মত চারপাশ জ্বলতে শুরু করতেছে আবার—তা কি করা। যতক্ষণ পারা যায় আঁচল সামলে রাখা। যখন হবে তখন দেখা যাবে।

নিতাই আর পারল না। সে এখন যোয়ান মদ্দ মানুষ। মাইয়া মানুষ ভয় না পাইলে চলে কি কইরা! সে উঠে পড়ল। বাবলির কাছে গিয়ে বসল। —তর ত চেতন নাই দেখতাছি!

বাবলির খোঁপা খুলে গেছিল। তাই বাঁধতে থাকল। কালবরণ মেঘের রাজকন্যা বাবলি। চোখ দুটো সজল। আবার খুব খেয়াল করলে বোঝা যায় রোষও চোখের কোটরে কম লুকিয়ে নেই। সে বাবলিকে এ-জন্য ভয় পায়। বাপ মরে যাবার পর একটা বড় বিতিকিচ্ছা অবস্থা। সে যোয়ান হয়ে উঠেছে। বাবলির পাখা গজাচ্ছে। উড়তেই পারে। ভয় হয়েছিল—কি করে বাবলিরে নিয়া! অভয় খুড়োকে বলেছিল, কি করি!

অভয় খুড়ো বলল, তা সমস্যা বটে।

এই সমস্যার কথা শুনে বাবলি রুখে উঠেছিল। —ভাত দিতে

পারবা না এই কথা!

তা কইছি।

তবে কি কইতে চাও?

বাপ ছেল। চইলা গেছে। এখন বাপ নাই—তরে লইয়া কি করি?

ডর লাগে?

ডরের কথা। যদি মাইনসে অ-কথা কু-কথা কয়।

অঃ। ডরে ধরছে। তা ডরে ধরলে, কলসি আইনা দাও। দড়িডা না হয় যোগাড় কইরা নিমু। নদীতে ডুইবে মরতে দ্যাও।

না, কইছিলাম!

বাবলি তারপর খিল খিল করে হেসে উঠেছিল। —তুমি না একখান মানুষই বটে। মাইয়া মানুষ আমি, তারে অ তুমি ডরাও। নিজে ঠিক থাকলে আর কার ডর। কিন্তু তুমি, নিজে ঠিক নাই।

নিতাই বড়ই সরমের মধ্যে পড়ে গেছিল। সে যে ঠিক নেই বাবলি টের পেয়ে গেছে। সে বলল, তা থাকতে চাস থাক। আমরা না আবার নষ্ট হইয়া যাই।

বাবলি চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। কথা দিয়েছিল, তাকে নষ্ট করে না দিলে সে নষ্ট হবে না। একঘরে দুই খুপড়ি। তালপাতার ছাউনি। বাঁশের বেড়া। কলাগাছ দু একখান। মানকচু জলকচু। সামনে পেছনে এক লপ্তে বিঘে দুই জমি। আর দূরে পল্লীর সব মানুষের জন্য ভেড়ি, বনে কাঠ। এই করে আর দু' চার সাল। ঠিকঠাক হয়ে বসতে পারলেই নিতাই ভেবেছিল, দুই হাত এক করে নেবে। এবং এ-ভাবেই দুই তরুণ তরুণী স্বপ্নের মধ্যে যখন বাস করছিল, যখন ভাবছিল,—আসলে সরকারী বাবুরা ঘুষ চায়, ঘুষ দিলে কাজও হয়—বনের কাঠ সহজেই নিয়ে আসতে পারে, এ-ভাবে ঘুষ দিলে এখানেও একদিন বসত করার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মিলে যাবে। তখন নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাওয়া। হাতে ঠাকুর বাপের সেই পেতলে বাধানো কোচ। বড় মাছের ঘাই দেখলেই

মার পাড়। যায় কোথা! বড় একখান চাঁই মাছ গেঁথে যখন বাঁশে ঝুলিয়ে ঘরে ফিরবে তখন বাবলি বলবে, হা মাছ মারিয়ের বংশই তোমার। তুমি মিছা কথার মানুষ না।

তারপরই মনে হয়েছে, শূন্যের মাঝারে বানাইল ঘরবাড়ি। অভয় খুড়োর চোখ দেখে টের পেয়েছে কিছু একটা নির্ঘাত হবে। আবার উচ্ছেদ। সেই কবে থেকে ঠাকুর বাপ উচ্ছেদ হল, বাপ উচ্ছেদ হয়েছে, এবারে তার পালা। কখনও মানুষ, কখনও প্রকৃতির রোষ তাদের এক বাসভূমি থেকে উপড়ে অন্য বাসভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। সে পরাশর জ্যাঠার সেই গানটাই বার বার শুনতে পায়। যেন নিরন্তর কেউ কোন বৃক্ষের নিচে বসে গেয়ে চলেছে, শূন্যের মাঝারে বানাইল ঘরবাড়ি।

বাবলি বলল, আমার কিন্তু পাক হইতে দেবি নাই।

কি পাক করলি?

খারগন পাতা বাটা।

বড় সরেস হাত বাবলির। যা পাক করে তাই অমৃত। মাছ না থাকলে খারগন পাতা বাটা। রসুন সম্ভারে যখন ঝাঁজ দেয়, বিদ্যাধরী নদী পর্যন্ত সুঘ্রাণ ছড়িয়ে যায়। ভাত হয়েছে। খারগন পাতা বাটা হয়েছে। গরম ভাত আর তার সঙ্গে পাতার সুবাস। একথালা ভাত নিতাই বড় পরিতৃপ্ত সহকারে খায়। সংসারে বাবলিকে নিয়ে থাকবে—এই যখন তার স্বভাবে এক বৃক্ষ বড় হয়ে উঠেছে তখনই—অভয় খুড়োর হাকার—শুনতাছি যারা জায়গা জমি ছাইড়া না যাইব, তাগ কপালে দুর্গতি আছে। সেই যেমন এক এক করে সারদা পল্লী সাফ হয়ে গেছিল, আবার নতুন বসতি জয়নগরও সাফ হয়ে যাবে। আবাদী জমি জলা বাতাস, পাখ পাখালি, পূজা পার্বণ আবার সব লাটে উঠবে।

খেতে বসে নিতাই বলল, না গেলে নাকি ঘরবাড়ি পোড়াইয়া দিব?

দেওক।

কস কি!

ঠিকই কই। দুজন মাইনষের ভাত হইব না! তুমি খাটবা, আমি

খাটমু। দুইজনে ঘাম ফেললে, পেটের ভাত ঠিক হইব। নিজের দ্যাশ ছাইড়া আর কোনখানে যামু না।

জোর কইরা যখন ট্রাকে তুইলা দিব।

হাত কামড়াইয়া দিমু।

হাজতে নিয়া যাইব।

এ-কথাতে কেমন ভয় পেয়ে গেল বাবলি। হাজতে বাবলি গেলে আর ফিরে আসতে পারবে না। তার নিতাইরে কে দেখবে! সে বলল চল না আরও জঙ্গলে ঢুইকা যাই। নিতাই বলল, জঙ্গলে গেলেও পার পাইবি না। পুলিশে না পারে এরম কাম নাই।

॥ চার ॥

নিতাইর ঠাকুরবাপকে তাড়িয়েছিল ধম্ম, তার বাপকে তাড়িয়েছে প্রকৃতি, আর সে এখন পুলিশের শ্যান চক্ষুতে পড়ে গেছে। নিতাই সারা বিকাল আনমনে ঘুরে বেড়াল। যেখানে যায় সেখানেই এক কথা। অভয় খুড়োর কাছে লোকজন দেখা করতে গেছে। উপায় বাতলে দেবে অভয় খুড়ো। যেমন পাথুরে উরাট জমিতে পরাশর জ্যাঠা তেমনি এখানে অভয় খুড়ো। সেই লম্বা মতো মানুষ। বাবড়ি চুল। এক বিধবা পিসি আর খুড়িমা, দুইজন সংসারে। সন্তান-সন্ততি বলতে যারা ছিল তারা জায়গা বদল করেছে। কেউ পারুলকুটে থেকে গেছে। আসেনি। কেউ শহরে গঞ্জে যে যার সংসার পেতেছে। এখন নিতাই, চায় একটা সংসার পাততে। এত বড় দেশ, এত জনমনিষ্যি, খায় থাকে বসবাস করে, তার মত একখান মানুষের জায়গা হবে না কেন সে বুঝতে

পারে না। সে শহরে গঞ্জে গিয়ে দেখেছে, কত ভিন দেশী মানুষ, এ-দেশের জলা বাতাসে গা ভাসিয়ে বেড়াচ্ছে। সে অভয় খুড়োকে বলেছিল, দ্যাশের মানুষ আমরা। সরকারের এত গে'সা ক্যান বুঝতাছি না।

অভয় খুড়ো তার দোচালা ঘরের দাওয়ায় বসে আছে। যারা কাঠ কাটতে গিয়েছিল, খবর পেয়েই চলে এসেছে। যারা করাত চালাচ্ছিল তারাও চলে এসেছে। আজ হাটবার। এখানে এসে অভয় খুড়ো হাট বসিয়েছিল। আনাজপাতি, হাঁড়ি পাতিল থেকে চাল ডাল নুন সব পাওয়া যায় হাটবারে। দেশের মত অভয় খুড়ো সব কিছু চায়। সবই হয়ে গেছে। আবাদ ভাল। বনের কাঠ বিক্রি করে লাভ। নদীতে জাল ফেললে অফুরন্ত গলদা চিংড়ি আর ভেটকি। যেখানেই জাল ফেলা যায় রূপোলি মাছে ভরে যায়। কিন্তু পুলিশে তাড়িয়ে বেড়ায় ব'লে চুপি চুপি কাজ সারতে হয়। আর না হয় কিছু দিলে কথা থাকে না। যারা হাটে যাচ্ছিল, তারাও শুনে গেল, নদীর ওপার থেকে অভয় খুড়ো কাগজ নিয়ে এসেছে। কাগজে কাগজে সব খবর বের হচ্ছে।

অঞ্চলের পাশেই বসিয়ে দিয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। গোঁফে চুমড়ি কেটে কেউ হাঁকও দিয়ে যায়। তখন বউ বেটিরা ঘরের বার হয় না। যোয়ান মানুষ থাকলে দাঁত বের করে হাসে। কথা কয়। বলে, কই যামু, খাইটা খাই। বাবুভাইদের উপদ্রব করি না। বাইচা থাকনের চেষ্টা আর কি!

মানুষ আইনের কাছে কত অসহায়, এই সব কথাবার্তা না শুনলে বোঝা যায় না। একজন সামান্য পুলিশ দারোগা তাদের কাছে তখন কত একজন মুরুব্বি মানুষ।

এই মুরুব্বি মানুষেরা ফাঁক খোঁজে। ভয় দেখিয়ে মাছ শস্য কাঠ আদায় করে নিয়ে যায়। আরও যারা বড় তারা পয়সা পেলে খুশি। কেউ কেউ আরও কিছু চায়। এবং এই লোভেই ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। যুবতী নারী দেখলে জিভে নাল ঝরে।

নিতাই বুঝতে পারে সব। রাতে যে যার ঘরে শুয়ে থাকে। যেন যে-কোন সময় হাকার আসবে। আসছে। অভয় খুড়ো শেষ পর্যন্ত বলে দিয়েছে সবাইকে, যে যেতে চায় যাও। ফিরা যাও। আমি যামু না। মরি বাঁচি হ্যাশেই থাকমু।

এই করে এখনও শেষ লড়াইয়ের জন্য মরিয়া হয়ে তারা পড়ে আছে। চরায় সব বড় নাও। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হলেও তারা পিছপা হবে না। ক'দিন তাই অভয় খুড়ো যোয়ান মদ্দদের নিয়ে, নাওয়ের গলুইয়ে পাছায় গাবের কস খাইয়েছে। গাব সেঁচে জলে ভিজিয়ে রাখার কাজে সবাই ক'দিনের জন্য দম ফেলতে পারেনি। বল্লম সড়কি যে যা পেরেছে ঘরে ঘরে তুলে রেখেছে। যেন জীবনের শেষ যুদ্ধ করবে নিতাই। এখানটায় করবে। বাপ, ঠাকুরবাপের মত অসহায়ভাবে সে মরতে নারাজ। মরবে না।

রাতে আকাশে নক্ষত্র জ্বলে। অরণ্যভূমি থেকে ভেসে আসে বাতাস। নদীর জলে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। তার নিচে গহীন গাঙ। মাছের রাজত্ব। সে দেখতে পায়, একটা বড় সিংহদুয়ারি বোয়াল মাছ উজানে উঠে যাচ্ছে। আর পাশের ঘরে খুটখাট শব্দ। বাবলি ঘুমাতে পারছে না। এ-পাশ ও-পাশ করছে। সে মনে মনে বলে, দুদিন সবুর কর। পাকাপোক্ত হইয়ে বসি। কারণ শুভকাজে পুরুত বামুন চাই, শাঁখা সিঁদুর চাই। নাকের কানের গহনা চাই। দু-চারজন পাড়াপড়শি না খেলে শুভকাজে বিঘ্ন ঘটে। সবুর করলে সব হবে। আগ থেকে উতলা হলে চলবে কেন ?

তখনই ও-ঘর থেকে কথা ভেসে আসে, অ নিতাই একবার মনে আছে তুমি আমি কলমি পাহাড়ে গেছিলাম।

নিতাই পাশ ফিরে শুয়ে বলল, মনে আছে।

পাশ ফিরলেই বাঁশের মাচানে শব্দ হয়। দুই ঘরে দুই মাচান। চিত হয়ে শুয়ে যুবতী কন্যে। ঘর-চায়। সংসার চায়। সে বলে, তা এত রাতে এ-কথা !

—মনের মধ্যে কে যে বাজায়।

—নিতাই বলল, মানুষের এই বাজনা নিত্য হয়। কি করবি ক'।

—কাইল তুমি বাড়ি আছিলা না। আমার ক্যান জানি ডর ধরল!

—ডর!

—হ। ঐ যে সখারাম না কি কও।

—আরে হ। দারোগাবাবু।

—তার চর আইছিল।

—চর! কি কইরা বুঝলি?

—না হইলে কয় ক্যান, তাইন নাকি বড় কষ্ট পায়।

—কার লাইগা?

—আমার লাইগা। তোমার লাইগা।

—ক্যাডা খবর দিল?

—শনে পিসি।

—কি কইল?

—কইল, সময় থাকতে সইরা পড়।

—কোনখানে?

—বাবু নাকি ব্যবস্থা কইরা দিব।

—তারে কইস, গলাখান য্যান ঠিক রাখে!

—তুমি বড় মাথা গরম লোক আছ।

আবার মাচানে শব্দ। বোধ হয় বাবলি উঠে বসেছে। জল খাচ্ছে।

—আমারে জল দিস ত। বড় পিপাসা।

বাবলি কুপি জ্বালিয়ে ওর ঘরে আসে। মাচানে বসে না। পাশে দাঁড়িয়ে জল বাড়িয়ে দেয়। কেমন উসখো খুসকো চুল। চোখে ভীষণ ইচ্ছের ভাব। নিতাই জলটা খেয়ে বলল, কি করবি ক। ধম্ম বলে কথা আমরা হলাম গে মাছ ধরিয়ের বংশ। সত্যবতী রাজকন্যের বংশ। কোন শাপে বাপ ঠাকুরবাপ গেল কে জানে।

বাবলি বুঝতে পারে মানুষটার ধর্মবোধ বড়ই প্রবল।

বাবলির শরীরে সবুজ আভা ফুটে উঠছে। চারপাশে ঝম ঝম শব্দ শুনতে পায়। আসলে চারপাশে না শরীরের মধ্যিখানে হচ্ছে! কে জানে! গোঁসাইরে দেখলেই তার চোখ কেমন নুয়ে আসে। শরীরে কাঁপন ধরে। যেন একখান ঠাণ্ডা জলের পুকুরে গোঁসাই এসে বড় ঢিল ছোঁড়ে। সব জল কেমন ছলাৎ করে ওঠে। ওর এইসব ভাবনার মধ্যে একসময় ঘুমও এসে যায়। এবং তখন নিতাই ডাকে, ও বাবলি আমার ঠাকুরবাপের সেই কিসসাটা তরে ত সবটা কই নাই।

—কও শুনি।

—বুঝলি না নারীর মাঝেই থাকে সূর্পনখা, মানুষই হয় রাবণ। কার কখন দিশা হারায় বোঝা কঠিন।

বাবলি আধঘুমের মধ্যেও ফিক করে হাসে। দু-খানা ডুরে শাড়ি সম্বল। যা আনে গোঁসাই খেতেই লেগে যায়। হাট থেকে তবু সেদিন নিয়ে এসেছে আর একখান নতুন শাড়ি। ওটা তুলে রেখেছে। নীল রঙের ব্লাউজ, সায়া। সে অবশ্য ব্লাউজ, সায়া বাড়িতে পরে না। বাড়িতে পরতে নাই। অত পয়সা গোঁসাই পাবে কোথায়? লুঙ্গি একখান সম্বল। রাতেও ডুরে শাড়ি কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে শুয়ে থাকে। আর আছে গোঁসাইর হাফ হাতা মার্কিন কাপড়ের জামা। বাবলি রাতে শুয়ে থাকলে আঁচল সরে যায়। একদিন সকালে ঘুম না ভাঙতেই গোঁসাই ঢুকে গিয়ে বেদিশা হয়ে গেছিল। কি রাগ গোঁসাইর। বলে কি না, এই মাইয়া, তোর শোয়া বড় মন্দ।

বাবলিও কম যায় না। চোখ উল্টে বলেছে, তোমার মরণ হয় না গোঁসাই। সময় অসময় নাই আমার ঘরে ঢুইকা যাও। মনে মনে অবশ্য বাবলি খিল খিল করে হাসে। হয়েছে ত কি হয়েছে! মন্দ শোয়া আমার কিগ। তোমার জিনিস দেইখে শুনে নিলে ক্ষতিটা কি আছে জানিনা বাবা।

সেই লোকটা এখন কিসসা বলবে বলছে। বাবলি বুঝতে পারে

গোঁসাইর মন খারাপ। তার ত মন খারাপ হয় না। যা হোক দু'জনের কোনরকমে চলে যাবে। নিতাই যদি লাশ হয়ে যায় সে সহমরণে যাবে। গলা কামড়ে ধরবে পুলিশের।

এত ভেবে মরলে মানুষ বাঁচে কি করে। বাবলি শোনার জন্য আগ্রহ দেখাল। সে কতবার শুনেছে। আজও আবার শুনতে হবে। সে বলল, কও শুনি। একটুকুন জেগে থাকলে মানুষটা যদি সুখ পায় তার ক্ষতি কি!

নিতাই বলল, থাক ঘুমা।

বাবলি পাশের ঘরে বুকের ওপর হাত রাখে। গোলপাতার ছাউনি হাহাকার বাতাসে ছর ছর করে। বেড়ার ফাঁকে দেখা যায় চমচমে জ্যোৎস্না। ধরণী শান্ত। কীটপতঙ্গের শব্দ পায়। তার মনে হয় নিতাই গোঁসা করেছে। সে বলল, রাগ করলা গোঁসাই!

—কথা কইলে তুই বড় খিল খিল কইরা হাসছ।

—ঠিক আছে মুখ গোমড়া কইরা রাখুম।

—তুই বোঝস না, কি দিন সামনে আইতাছে।

এই কথায় তার আবারও হাসির উদ্রেক হয়। কারণ জন্মেই সে দেখেছে, চারপাশে নিত্য এক উপদ্রপ, কি খাবে না খাবে জানে না। মড়কে চোখের সামনে উজাড় হয়ে গেল সব। কাকা পিসি দিদি। এক রাতেই তিনটে মরা বের হল। মা আবাগি ঘরে থাকল না। সকালে উঠে ঘুমের ঘোরে মাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখেছে মা আবাগির বেটি বিছানায় নেই। নেই নেই। সে তখন কাঁদত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদত। কাঁদতে কাঁদতে একবার কলমি পাহাড়ের পথ ধরে অনেক দূরে চলেও গিয়েছিল। তার কেন জানি মনে হত, মাকে কোন দুষ্ট লোক চুরি করে নিয়ে গেছে। অনেকটা সীতা হরণের মত মনে হত। মা আবাগির যদি কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গা খুঁজে পায়, যদি কানের মাকড়ি খুঁজে পায়। যেমন রাম লক্ষ্মণ গিয়েছিল সীতার খোঁজে সে তেমনি বের হয়ে পড়ত। কাউকে না বলে না কয়ে বের হয়ে পড়ত। শেষে নিতাইকে

সঙ্গে নিত। সুগ্রীব দোসর যেন। বনে বনে কিংবা পারুলকোটের বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত। বাসে যদি মা ফিরে আসে। বাবলির এই করে বড় হ'তে হ'তে মনে হয়েছে তার পোড়াকপাল। ভাঙ্গা কপাল। সে দিনকাল আর ভালমন্দ কিছু বোঝে না। সে বলল, তোমার ঠাকুরবাপরে নিয়া সেই যে হাসিম মিঞা রওনা হইল তারপর?

তারপর ঠাকুরবাপ যায় আর যায়।

কোনখানে যায়।

কৈ যাইব জানে না। বাপের খবর নাই। ঠাকুরমার খবর নাই। কেবল ডাকে, অ সুরিনডারে? অ কিরনীরে। তরা কই গ্যালি।

খুঁইজা পাইল না। বাবলি যেন প্রথম শুনছে এমন করে বেড়ার ও-পাশ থেকে গলা উঁচা করে ধরল।

বাবলির জন্য নিতাইর কষ্টের অন্ত নাই। এই একখানে এসে ঠেকেছে। তার যা পছন্দ বাবলিরও তাই। ঠাকুরবাপের কথা শুনতে বড়ই আগ্রহ। ঠিক যেন রামায়ণ পাঠের মত। যত শোনা যায় ততই পুণ্য। বাপ দাদার জীবন বড়ই পুণ্য হে। নিতাই এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝে না। যেন এই জীবন যতবার বলবে তত তার সাহস বাড়বে। পাপ খণ্ডন হবে। পাপ না থাকলে তার কেন বসত হয় না। বাপ দাদা সেই যে ঘর ছাড়া হল, আজও তারা ঘর ছাড়া। বড় পাপ হে।

সে ফের বলল, তা যায় আর যায়।

বাবলি শুনতে থাকল। সেই সুদূরের এক জীবন—একজন মানুষ যাচ্ছে আর একজন মানুষকে পার করে দিতে। মানুষের ক্ষয় নাই।

হাসিম মিঞা আর ঠাকুরবাপ মাঠে নাইমা গেল। ঘুট ঘুইটা আনধার রাইত। দূরে বাড়ি ঘর জ্বলতাছে। কে যে জ্বালাইল!

এইভাবেই নিতাই বাপ দাদার জীবনের কথা বলে যায়। বইয়ের পাতায় লেখা থাকলে এমন শোনাত—আহা কত ঘাস এখানে, কত পাখি এখানে, সবুজ গন্ধ ছিল মাঠময়। ঝড়ো বাতাস, জলাজমি, নদী নালা, শস্যক্ষেত কত ছিল এখানে। বারোমাসে তের পার্বন, শীত

গ্রীষ্ম ছয় ঋতু আরও কত কি ! পরান সব পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে। বাপ দাদার ভিটায় জীবনেও বুঝি আর ফিরতে পারবে না। ওর কিরণী কোথায়, সুরিনডা কোথায় সে জানে না। মাটির মত নদীর মত আর কি প্রিয় জিনিষ আছে মানুষের। জাবিদা অন্ধকারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দেখছে আর কত স্মৃতি ভেসে উঠছে। দুঃখের দিনে সুখের দিনে পরাণ, পরাণের মা মাধুপিশি—সকলের কথা মনে হল জাবিদার। মোত্রা ঘাসের জঙ্গলে একবার পরাণ আবিষ্কার করেছিল—জাবিদা দশমাসের পোয়াতি, জাবিদা ছাগল নিতে এসে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। কোলে করে পরাণ জাবিদাকে এই মাঠ পার করে দিয়েছিল, ঘরে এনে হাসিমকে গালমন্দ করেছিল। সেই পরাণ ওর প্রিয় মাঠ জমাজমি; গহীণ নদী ফেলে চলে যাচ্ছে। আর এ-দেশে ফিরবে না। জাবিদার চোখে জল এসে গেল।

আর হাসিম পরাণ কখনও আগুনের ভিতর দিয়ে, কখনও নির্জন মাঠের অন্ধকার অতিক্রম করে ছুটে চলেছে। পরাণ তফণ পরেছে। টুপি মাথায়। যেন হজে যাবে বলে বের হয়েছে। হাসিমের কাঁধে লাঠি। লাঠির মাথায় চিড়ার পুঁটলি। পুঁটলির মধ্যে একখান জাম-বাটি। যখন পরাণ চলতে পারবে না, জলের মধ্যে শীতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ঠক ঠক করে কাঁপবে তখন এই জামবাটিতে চিড়া ভিজিয়ে সামান্য আখিগুড় দিয়ে খেলে বল পাবে। ফের ডুব সাঁতার দিতে অথবা পাতিলের নিচে ভেসে থেকে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে।

পরাণ তখনও, আমার কিরণী গেল কই, সুরিনডারে—এইসব বলে যেতে যেতে কপাল চাপরাচ্ছিল।

হাসিম সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে। —অগ কিছু হয় নাই। অরা লোকজনের সঙ্গে ঠিক পালাইয়া গেছে। নারানগঞ্জে ঠিক দেখা পাইবা। কাইন্দনা। কপাল থাবরাইয় না। টের পাইলে তোমার আমার মরণ। তবু পরাণ কথা শোনে নাই। মাঠের মধ্যে বসেই হাউ হাউ করে কাঁদছিল। আসলে ঘরবাড়ি হারিয়ে পরাণ পাগল হয়ে গেছে বুঝি। পেছনে হাসিম। চারপাশে সতর্ক নজর রাখছে। সদর রাস্তা ছাড়া

আর পথ নাই। সদর রাস্তায় উঠে এমন করলেই গেছে। হাসিম কেবল বুজ প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য, নদী পার হবার জন্য এবং নদীতে ভেসে অনেক দূর অনেক পথ সাঁতার কাটার জন্য প্রেরণা দিচ্ছে হাসিম। যেমন তার কথা ছিল, যে যেদিকে পারছে, যেভাবে পারছে পালাচ্ছে। গঞ্জে বৌঠাইন হয়ত সরকারী তাঁবুতে পরাণের জন্য অপেক্ষা করছে। সবই আন্দাজে বলছিল হাসিম। মাথায় যা আসছে বলে যাচ্ছে। তার কাজ এখন পরাণকে নদীর ওপাড়ে নিয়ে যাওয়া।

পরাণকে সান্ত্বনা দিয়ে কোনরকমে সাঁকো পর্যন্ত হাঁটিয়ে এনেছে হাসিম। এবারে সাঁকো পার করে দিতে হবে। সাঁকো পার হলেই দনদির মসজিদ। কিছু লোক সেখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। সলা-পরামর্শ করছে। এরা কারা কে জানে! সে পরানকে মসজিদের পাশ দিয়ে নিয়ে গেল না। মাঠে নেমে গেলে দেখতে পাবে না। পরাণকে নিয়ে সে মাঠে নেমে গেল। পায়ের নিচে তামাকের খেত, পেঁয়াজের খেত—সেই সব খেতে দুই মনুষ্য হামাগুড়ি দিতে থাকল। কুয়াশার জলে ভিজে যাচ্ছে হাত পা মুখ। ঠাণ্ডা নিশুতি রাত। আগুন জ্বলছে এখানে সেখানে। হিমেল হাওয়া। পরাণ হালদারের বোধ-বাস্তি গেছে। বুঝতেই পারছে না প্রবল হিমেল ঠাণ্ডার মধ্যে সে তামাকের ক্ষেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। হাসিম এরই ফাঁকে মন্ত্রের মতো ওর নতুন নাম, বাপের নাম মুখস্থ করিয়ে যাচ্ছে। নাম কি মিঞা?

—মহম্মদ ইদ্রিশ।

—বা'জানের নাম?

—মহম্মদ ইমানুল্লা।

অথবা হাসিম বার বার বলে দিচ্ছে, নাম না বলতে পার বোবা বনে থাকবা। যা বলার হাসিম বলবে। ব্যারামী নাচারি মানুষ, শহর গঞ্জে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে। নাচারি ব্যারামী মানুষ নিয়ে এই আনধার রাইতে? —তা কি করমু কন, কাইল সকালে নাড়ি দেখব কথা আছে। ফজরে পৌছাইতে না পারলে বড়ই দায়। তারপরই হাসিম নিজের সঙ্গে

কথা বলল, তোমার যেমন হইছে মিঞা, বলদা এইয়রেই কয়। তা অবশ্য ঠিক, হাসিম বুঝতে পারে এইসব বললে, ওদের সংশয় আরও বাড়বে। ন্যাংটা করে দেখবে। দেখলেই বুঝতে পারবে। সবটাই আছে। আল্লার নামে কিছুই খোয়ায় নি। ছ্যাও জবাই কইরা। কিছুটা যে ছ্যায় নাই, তার সবটাই দিয়া দাও। কোরবানি যাবে কয়।

॥ পাঁচ ॥

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিতাই দেখল, উঠোনের মাঝখানে কে একটা বল্লম পুঁতে রেখে গেছে। এটা কার কাজ! ঘরে ঘরে বল্লম লাঠি সোটা, অভয় খুঁড়ো, মনীন্দ্র, কালীপদ সবাই ঘরে ঘরে এ-সব রাখার কথা বলে গেছে। নিতাইর ঘরেও আছে। বাড়তি আছে একটা বড় মাছমারার কোচ। কোচটা ঠাকুরবাপের আমলের। বাপ হল্লার মধ্যেই কোচটা নিয়ে বের হয়েছিল। ঠাকুরবাপও বের হয়েছিল। তারপর হল্লা। মশাল, মার মার, কাফের যায়, এবং ভয়ংকর এক ধ্বনি, যা শুনে বাপের কলিজা ফাটে প্রায়। বাপ দৌড় আর দৌড়। কতক্ষণ দৌড়েছিল জানে না। বন জঙ্গল, বিলের মাঠ, সাঁকো বাজার হাট পার হয়ে সোজা নারানগঞ্জে। কোচটা হাত ছাড়া করেনি। সেই কোচটা বাপ পরে এ-দেশেও পাচার করে দিয়েছিল। ঠাকুরবাপের চিহ্ন। সেই পাহাড়ে পাথুরে জমিতেও বাপ নিয়ে গেছিল কোচটা। আবার এখানে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছে নিতাই। তিন পুরুষ ধরে কোচটা বংশের ইজ্জত রক্ষা করে আসছে। এটাই একটা সান্ত্বনা নিতাইর মনে। সে ডাকল, ও বাবলি! উঠানে বল্লম পুইত্যা গেল কেডা?

বাবলির সাড়া নেই। সকালে উঠেই বাবলি কোথায় গেল! কাঠ কুটো আনতে যেতে পারে। পাউরুটি আনতে যেতে পারে। অথবা উঠোনে গোবর ছড়া দেবার জন্য রাস্তাঘাট থেকে গোবর সংগ্রহ করতে যেতে পারে। সাড়া না পেয়ে সে রাস্তায় নেমে গেল। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হল, বলল, বাবলিরে দ্যাখছ।

কেউ কিছু বলতে পারল না।

নিতাই রহস্য ধরতে পারছে না। তাজা বাঁশের বল্লম কে পুঁতে রেখে গেল উঠানে। বাবলিই বা কোথায়। বড় ভাবনায় পড়ল। রাস্তাটা ঘুরে গিয়ে আচার্য পাড়ায় পড়েছে। তারপর পাঁতকুঁয়োর পাশ দিয়ে গেছে সামনের বিদ্যাধরী নদীর দিকে। নদীর চরাতে সে নেমে গেল। তখনই দেখল জল সাঁতরে কে এ-পারে আসছে। একবার মাথাটা জলে ডুবছে, আবার ভাসছে। আর কি যেন নিতাইকে বলার চেষ্টা করছে। আরে এ যে বাবলি। রাতের গরম সহ্য হয় নি। সাত সকালে নেমে গেছে চরায়। সে কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। —তর এত গরম মাইয়া। ঘর দরজা খোলা রাইখা শরীর ঠাণ্ডা করতে আইছুস।

কিন্তু কাছে যেতেই বুঝল বাবলি কেমন জল থেকে উঠে আসতে পারছে না। কোমর ভেঙ্গে গেছে মত। চোখ ঘোলা ঘোলা। শরীর সাদা হয়ে গেছে। এমন দুরন্ত বাবলি, তার এ কি দশা। সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শক্ত হাতে বাবলিকে তুলে ধরলে দেখল প্রায় সংজ্ঞা-হীনের মতো। সে চিৎকার করে উঠল, বাবলি তর কি হইছে!

বাবলি কোনরকমে চোখ খুলে দেখল, তারপর ফের চোখ বুজে ফেলল। এখনও লোক ঘুম থেকে ওঠেনি। এখনও ভাল করে সকাল হয় নি। তবু কেন যে পাউরুটির কথা ভাবল নিতাই। এত সকালেত নরহরি দোকান খোলে না। সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। বল্লমটা তার উঠানে পোতাই আছে।

নিতাই সহসা আর্তনাদ করে উঠতেই বাবলি শক্ত হয়ে গেল। বলল, না না গোঁসাই তুমি হল্লা কইর না। আমার শরীরে কিছু নাই।

একখান শাড়ি! জলের মধ্যে নিতাইর হুঁশ হয় নি। পাকাল মাছের মত বাবলির শরীর পিছল। শরীরে বসন ভূষণ নাই। মাইয়ামানুষের ইজ্জত নিয়া তবে টানাটানি হইছে। সে ক্ষোভে দুঃখে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলে ফের বাবলি বলল, দেরি কইর না। মাথা গরম কইর না। একখান শাড়ি আন।

নিতাই পাগলের মত ফের নদীর পাড় ধরে ছুটতে থাকল। কাছেই বৃন্দাবন কাকার বাড়ি। সে উঠানে দাঁড়িয়ে এত হাপাচ্ছিল যে কথা বলতে পারছিল না। বৃন্দাবন ঘরের দাওয়ায় বসে ছাই দিয়ে দাঁত মাজছিল। নিতাইকে দেখল, কেমন চুল খাড়া খাড়া, চোখ লাল। আর কি চাইছে। খুড়ি বের হয়ে এসেছে। পোলাপানরা লগে বাইর হইয়া পড়ছে। নিতাই ফ্যাস ফ্যাস গলায় বলল, খুড়ি ছ্যান। আমারে ছ্যান। তাড়াতাড়ি।

এই সকালে কি চায় নিতাই! নিতাই আর দেরি না করে ঘরে ঢুকে গেল। দড়িতে ঝোলানো সাড়ি ছিল। তাই নিয়ে ছুট লাগাল। বৃন্দাবন হতভম্ব। বৃন্দাবনের বৌ বলল, নেতাইর কি মাথা খারাপ হইয়া গ্যাল। কথা নাই বার্ত্তা নাই, শাড়ি নিয়া ছুট দিল।

বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে রাস্তায় নেমে যাবে ভাবল। কখন কি খবর আসে। সব মানুষই চায় এরা উৎখাত হউক। বিচার চাইলে বিচার পায় না। কোন আইন নাই। যুবতী মাইয়া নিয়া চইলা যায়, জোর জবরদস্তি যা খুসি করে—কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না। আগে বসত নিশ্চিন্ত না হলে বাড়তি কাজিয়া কেউ ডেকে আনতে চায় না।

তখন ছুটছে নিতাই। বুক জলে বাবলি। বাবলিকে সাড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, উঠে আয়। কি হইছে ক, উঠানে বল্লম পোইতা দিল কে। বলেই সে পাড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। লোকজন নেমে আসছে। মাথা খারাপ না হলে কে কবে কার ঘরে ঢুকে শাড়ি নিয়ে ছুট লাগায়। বৃন্দাবন কালীপদ এবং আচার্য পাড়ার সবাই নদীর পাড়ে নেমে এসে বুঝল, বাবলির ওপর নজর পড়েছে। ওরা মাথা হেট করে

যে যার মত দাঁড়িয়ে থাকল।

নিতাই সহসা চিৎকার করে উঠল, কে নিল তরে?

অভয় খুড়ো খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। যেন বিচার হবে বাবলির। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে। প্রতিশোধ চাই। নিতাই মাথা হেট করে বসে আছে। বাবলি শুধু বলল, শনে পিসির কাজ। আপনারা মাথা গরম করবেন না। মাথা গরম করলে গোঁসাইরে তুইলা নিয়া যাইব কইছে।

—কই নিব?

—তা কিছু কয় নাই।

বাবলির সেই জড়তা নেই। যেন কপালে এইসব লেখাই আছে। একটু ধাতস্ত হতেই বাবলির একেবারে স্বাভাবিক গলা। সে নিতাইর দিকে তাকিয়ে বলব, লও, ঘরে যাই।

অভয় খুড়ো তখন হুঁকার দিল, কি হইছে কবি ত।

বাবলি হাঁটতে থাকল। কি বলবে! তার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছে কারা সে জানে না। যখন জ্ঞান ফিরে আসে দেখেছে জঙ্গলের মধ্যে কারা তাকে নিয়ে এসেছে। তার মনে হয়েছিল, শনে পিসিরই কাজ। দারগাবাবুর ক্যামপে শনে, পিসি জল তুলে দেয়। বাসন মাজে। রান্নাবান্না করে বাবুদের খাওয়ায়। বাবুরা পিসির লায়েক ছেলেদের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। শনে পিসি আর এখন তাদের লোক নয়। খাতায় তার নাম লেখাতে হয় নি। বাবুদের কৃপা পড়ে গেছে শনে পিসির ওপর। আকাজ কুকাজ শনে পিসি করে বেড়াতে পারে। মনে হয়েছিল তারে যে নিয়া গ্যাল, তাও সেই ডাইনির কাজ। দারগাবাবু নাকি শনে পিসির ধর্মবাপ। ধর্মবাপের জন্য ডাইনিটা তার দিকেও হাত বাড়িয়েছে! আন্দাজেই সে বলেছে, শনে পিসির কাজ। বলে ঠিক করেছে কি না জানে না। না বলাই ভাল ছিল। তারপর মনে হল কিম্ভুত কিমাকার কয়েকজন অমানুষ তারে ঘিরে রেখেছিল। তার বুঝতে অসুবিধা হয় নি, চেষ্টা করে লাভ নেই। মরার মতই পড়ে থাকল। তারপর ফিস ফিস

কথাবার্তায় বুঝেছে, নৌকায় আবাব তুইলা নিব। জলা জঙ্গল জায়গা। বসত নাই মাইল যোজন ধরে। এই অমানুষরা যা খুশি করতে পারে। চষর নদীর পাড় হবে। জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে আসছিল। আর অমানুষরা তারে নিয়া যখন নৌকায় আবাব তুলেছিল, মরার মত ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল, তখনই জলে ঝাপ দিয়েছে সে। জলে কুমির আছে। মানুষেবা তার কাছে তখন তাব চেয়েও ভয়াবহ। সে উজানে সাঁতাব কেটেছে। ভাটি উজান নদীতে কখন আসে তার জানা হয়ে গেছিল। সে জানে উজানে গেলেই লোকালয় পাবে। ডুবে ডুবে কখন যে তার শাড়ি শবীর থেকে খসে গেছে টেরও পায় নি। কেবল পালাবার সময় অমানুষদের হাকাড় শুনেছিল, যায় যায়। সেই কবে থেকে তাবা, যায় যায়। গোঁসাইর ঠাকুর বাপ যায় যায়। গোসাইর বাপ, যায় যায়। গোঁসাইর হবু বউটারও কপালেও তাই। তুই বাবলি পালাবি কোথায়। জায়গাটা ভাল লাগল না। সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। তর গোঁসাইর কাজ হত। তুই সুখে থাকতি। পালাইতে চাস। যা, পালা, একসঙ্গে ছুইটারে ধরে আনব তখন বুঝবি গরমেণ্ট কারে কয়।

এই প্রথম বাবলির হুঁস হল, যৈবন বড় দায়। লোভানি টাটানি চলতাছে। কোন দণ্ডে যে তারে খাবে। সে কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। কারও নাম বলে সে ঠিক কবে নি। কারণ সে বুঝতে পেরেছে জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। ফিরে গেলেও উরাট জমি, পাথুরে মাটি, জল নাই শষ্য নাই। ঘর নাই বাড়ি নাই। তিন পুরুষ ধরে এই ঘর-বাড়ি ছাড়া জীবনে এখন তার আর এক অনিশ্চয়তা এসে গেছে। সে যেতে যেতে বুঝতে পারল, জয়নগরের তাবৎ মনুষ্যজন এখন তার পিছু পিছু হাঁটছে। সবার শেষে গোঁসাই। গোঁসাই একটা কথা বলছে না। সে এবার পেছন ফিরে বলল, আপনেরা বাপ কাকারা যান। আমার কিছু হয় নাই।

পাগল হয়ে যায় নি ত বাবলি! কিছু হয় নাই কইলেই হইল।

কে যেন বলে উঠল, এডা তর মিছা কথা।

বাবলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কে বলছে! সেই নরহরির বেটা রঘু দাস। গোঁসাইর বয়সী। আড়ালে আবডালে তাকে রঘু দাস দু একবার চোখ পিট পিট করে কিছু বলতে চেয়েছে। রঘু দাসের শরীরেও পিঁপড়া কামড়ায়। সেই রঘু দাস সতীত্ব যাচাই করবার অছিলা খুঁজছে। বাবলির সারা গায়ে যেন আগুন জ্বেলে দিল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

অভয় খুড়ো বলল, আমরা বিচার চাই?

বাবলি আবার দাঁড়াল। বলল, কার কাছে?

জনতা এই কথায় কেমন মুহ্যমান হয়ে গেল। সত্যিই ত, কার কাছে বিচার চাইবে। ভগবানের কাছ ছাড়া আর কার কাছে বিচার চাইবার আছে। তারাত কেউ আর এখন জনগন নয়। তারা আজব জীব। সবকারী জমি দখল করে পুনর্বাসন্ চাইছে। বাঁচতে চাইছে। বনের কাঠ কেটে, নদীর মাছ ধরে, বাঁধ দিয়ে শস্য ফলিয়ে আকাশের নিচে নিজের দেশে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। বাবলির এই প্রশ্নে কেমন সব মানুষগুলির মুখে কে কালি ঢেলে দিল। নরহরির বেটা রঘুদাস তবু ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, নিতাই তুই মরবি। মাগি বড় বজ্জাত। কারও লগে পালানের তালে আছে।

অভয় খুড়ো, বৃন্দাবন, মনীন্দ্র এবং অন্যান্যরা জানে, নেতাইর আর সোমত্ত মাইয়াটারে ঘরে রাখা ঠিক না। সুরিনডা বেঁচে থাকতে একটা কথা ছিল। এখন সুরিনডা নাই। দুইজনই জোয়ান হয়ে উঠত্যাছে। মাথা ঠিক রাখা দায়। মনীন্দ্রই বলেছিল নিতাইকে, নরহরির বেটার লগে বিবাহ দিয়া দাও। তোমরা এহনে বড় হইছ। এক ঘরে থাক, মানুষে অ কথা কু-কথা কয়। নরহরিরে কই, চাইয়া চিন্তা পয়সা যোগার করি। ছন্নছাড়া মাইয়াটার গতি হইয়ে যাউক।

নিতাই বলেছিল, বুঝে দেখি।

সেই বুঝে দেখা বছরখানেক ধরে চলেছে। বুঝে দেখি অর্থাৎ সে তার মনের সঙ্গে কথা বলে নিতে চায়। বাবলিকে বলাও কঠিন। বড়

চোপা মেয়েটার। প্রস্তাবটা শুনলেই জ্বলে উঠবে। রঘুদাস আমারে বিয়া করব কয়! অর সাহস ত কম না। ছাখি বাপ বেটার ক্ষেমতা কত। তুমি আমার নাই? তুমি কি গোঁসাই মইরা গেছ? চোপার ভয়ে সে বাবলিকে কথাটা বলতে সাহস পায়নি। আর এই বুঝে দেখি করতে গিয়েই তার মরণ হয়েছে। যত দিন গেছে, তত তার টান বাড়ছে বাবলির জন্য। সে বাবলিকে ছাড়া আর কিছু জানে না। সে আশা করেছিল, বসতের অনুমতি মিলে যাবে। সরকার সব জায়গাতেই ভয় দেখায়। দেশের কত জন এসে জবর দখল করে বসে গেল। আড়ত করল পাটের। জমিজমা কিনা এখন এক একজন বড় সওদাগর বইনা গ্যাছে। বাপের মুখেই এ-সব খবর শুনেছে নিতাই। এই সব শুনেই ট্রাকে উঠে পড়েছিল লাফ দিয়ে। আসার আগে একবার সেই কলমি পাহাড়ে গেছিল, সেখানে কত নাম না জানা মানুষের চিতা সাজানো হয়েছিল। তার মায়েরও। দেশের মানুষজনদের ফেলে চলে গেলে কষ্ট। সে মরনই হউক, আর বাঁইচাই থাকুক। সবার কাছ থেকেই বিদায় নিতে হয়। কলমি পাহাড়ে সে আর বাবলি গিয়েছিল, বিদায় নিতে। পোড়াকাঠ, ভাঙ্গা কলসী, ছেঁড়া কাঁথাবালিস, চট মাদুরে জায়গাটা ভয়াবহ। তবু সেদিন নিতাইর মনে হয়েছিল, সব আপনজনই মঙ্গল কামনা করে। সে আর বাবলি গড় হয়েছিল। বলেছিল, আমরা নিজের ছাশে ফিরা যাইতাছি মা। তুমি বাইচা থাকলে আজ আমাগ কত সুখের দিন ছিল।

বাবলি হেঁটে যাচ্ছে। জয়নগরের সব নরনারী দূরে খুপড়ির আশেপাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছে। সাত সকালে আবার নতুন উপদ্রব। বাবলিরে নিয়া কানাঘুসা কত কথাবার্তা হয়। ঘরের সতী-লক্ষীরা ভয় পায়, সোমত্ত মাইয়াটা নিতাইর ঘরে আছে। কিছু হতে কতক্ষন। হলে বড় অধর্ম হবে, পাপ হবে। মাইয়াটারে নিয়া মানুষের চিন্তার অন্ত নাই। সেই মাইয়াটা রাতে কার লগে পালাইছিল, সকাল না হইতেই আবার ফিরা আইছে। সবারই ঘরে ছেলেমেয়ে

আছে। কার কপালে কি লিখন থাকে—আগে থাকতেই সাবধান হওয়া ভাল। মাইয়াটার একটা বিহিত করুক মোড়ল মাতব্বরেরা। এ-ভাবে পাপ নিয়া বসত করা ঠিক না। তেমন চোখ নিয়ে সবাই দেখছে এখন বাবলিকে। বাবলি নাকি এখানকার হুজুর মানুষ সখারামকে জড়াতে চায়। সখারাম আছে বলেই বিপদ আপদ কম। কাঠ কাটতে মাছ মারতে গিয়ে যারা ধরা পড়ে তাদেব সখারাম থানায় চালান দেয় ঠিক, আবার সে-ই কৌশল করে ছাড়িয়ে আনে। সখারাম বড় বিবেচক মানুষ। সে না থাকলে কবেই বাস উঠে যেত। তার বিনিময়ে সখারাম পয়সা নেয়। তা নিক। তবু মানুষটা ওদের আপনজন। মাঝে মাঝে পুলিশের উপদ্রব যে বাড়ে, সে শুধু সরকারী লোক বলে। তারত কাজের হিসাব দিতে হয় সরকারের ঘরে। মিনি মাগনায় ত আর সরকার বসিয়ে খাওয়ায় না। সখারাম একা কত সামলাবে। এই যে অভয় খুড়ো খবর নিয়ে এসেছে, যারা ফিরে যাবেনা, তাদের ঘরবাড়ি পুলিশ পুড়িয়ে দেবে ঠিক করেছে, উচ্ছেদ করবে বলেছে, একমাত্র সখারামই পারে তার বিহিত করতে। সে করেছেও। কিছু কিছু লোককে সে বলেছে, এক জায়গায় থাকা ভাল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়। রাজ্যটা ত ছোট না। উত্তরে পাহাড় যোযন ব্যাপী, নিচে সমুদ্র, লক্ষ কোটি মানুষের বাস। তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে গরমেন্টের সাধ্য কি ধরে। গোঁয়ার লোকেরাই মরে। অভয় মরবে। নিতাই মরবে।

সুতরাং বোঝাই যায় জয়নগরে আবার বিভীষণ ঢুকে গেছে। কেউ কেউ খাতায় নাম লিখিয়েছে। তারা আবার ফিরে যাবে বলেছে। এদের মধ্যে নরহরি পাণ্ডা মানুষ। সে এসে বলেছে, ফিরা গেলে জোত জমি নতুন করে গরমেণ্ট দেবে। বসত বাড়ি বানিয়ে দেবে। হাল দেবে। বলদ দেবে। বীজের ধান দেবে। সার দেবে। গরমেণ্ট এত করে, তবু যশ নাই।

অভয় খুড়োর কথা অন্য রকমের। —মরি বাঁচি নিজের ঘাশে থাকমু। তার কাজই লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ানো। শহরের কিছু বাবু

ভাইদের সঙ্গে দোস্তি আছে। লোকজনও আসছে দেখতে। মেলা কিংবা তামাসা দেখার মত ঘুরে ফিরে দেখে যাচ্ছে। আর এই বৃন্দাবন, মনীন্দ্র, কালীপদদের যা হয়, দেখা হলেই কথা, কি গরমেণ্ট কি কয়? আপনেরা কিছু জানেন? তখনই এইসব নিবাসীরা ভয় পায়। —যাবে কেন। থাক। সব লোক থাকতে পারে তোমরা থাকবে না কেন? গরমেণ্টের কথায় এলে বাবু ভাইরা সাহস দেয়, ও ঐরকম করে! তোমাদের রাখতে হলে গরমেণ্টের দায় বাড়ে না? কেউ আবার উল্টো কথা বলে গেছে, মানে মানে সরে পড়। গরমেণ্টের লোক ক্ষেপে আছে। কথা নেই বার্তা নেই হুট করে চলে আসালেই হল। এটা চক্রান্ত ছাড়া কিছু না।

অভয় জানে, তারা চক্রান্ত বোঝে না। কারো ওপর তাদের ক্ষোভ নেই। ষড়যন্ত্র করেও তারা আসে নি। আসলে বেঁচে থাকাব জন্যে চলে এসেছে। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুললে যা হয়, পাথুরে মাটিতে তাদের তাই হয়েছিল। বছরের পর বছর খরা। বছরের পর বছর আকাল। জোয়ান ছেলেমেয়েদের চোখে মুখে হতাশা। পাহাড় থেকে খরার সময় কাঠ কেটে আনতে পারে। কেনার লোক নেই। দূরের পাহাড়ে পাথর ভাঙতে যেতে পারে, যাবার রাস্তা নেই। ঘরে অসুখ-বিসুখ হলে এক দিনের পথ ডাক্তার বদ্যির দেশ। শুধু খা খা করছে প্রান্তর আর ঘাস, টিলা জমি, বনজঙ্গল। জলের আকাল থাকলে জলা দেশের মানুষ বাঁচে কি করে।

ফলে জয়নগরে এখন দুই পক্ষ। এক পক্ষ খাতায় নাম লিখিয়ে বসে আছে। লঞ্চ আসলেই উঠে পড়বে। আর এক পক্ষ কিছুতেই উঠবে না। নৌকার কাঠে গাবের কষ খাওয়াচ্ছে। জানে এক যুদ্ধ হবে গরমেণ্টের সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে। ইচ্ছা করলে অভয় ক্ষেপে গিয়ে এক দিনে পুলিশের ক্যামপ জ্বালিয়ে দিতে পারে। সখারামকে নদীর চড়ায় পুঁতে দিতে পারে। কেউ টের পাবে না। কিন্তু বড় দায় আছে। পুলিশের গায়ে হাত তুললেই বড় ঝকমারি – তখন আগুন দেবে, ঘর-

পাকড় হবে। ধর পাকড়ের নামে যুবতী মেয়ে ভগবানকে পাচার করবে। এইসব বড় অরাজকতার সামিল। কে আর আগ থাকতে সাপের মুখে ছোবলের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

এই যে বাবলি চলে যাচ্ছে, অভয় খুড়ো একটা কথা বলতে পারছে না। যেন বাবলি বলে গেল, কি দ্যাশে নিয়া আইলেন? এই অ্যাপনের দ্যাশ! দ্যাশের মানুষ! হে-পারে যাই নাই। গোঁসাইর ঠাকুরবাপবে তাড়া করেছিল যারা বাপ ঠাকুরদারে তাড়া করেছিল যে, তাগ চাইতে কোন ধম্মে আপনের দ্যাশের মানুষ বড় কন! সখা-রামের বাড়িত হে-পাড়ে আছিল। আপনের আমার মত কথা কয়। দ্যাশের কলাডা মুলাডার নামে চক্ষে জল আসে। তার লোক আমারে লইয়া যায় ক্যান কন! জবাব দ্যান।

নিতাই ঘরে ফিরেই সহসা কেমন ক্ষেপে গেল। ঘর থেকে কুড়োলটা বের করে বাবলির মাথায়, মারবে এক কোপ—যা থাকে কপালে, আসলে তুই নষ্ট মাইয়া। রঘুদাস ঠিকই কইছে। আমার ঘরে ঢুকলে আর নড়তে চাস না। তর শরীরে আগুন জ্বলতাছে বুঝি না ছ্যামরি! দিমু এক কোপে খালাস কইরা। এই ভেবে সে যেই না কুড়ুল তুলে ছুটে গেছে বাবলির দিকে, তখন বাবলি এতটুকু ভীত নয়। —মার মার। ডরাইলা গোঁসাই। সবাই হায় হায় করে ছুটে আসছে। বাবলি স্থির চোখে সবাইকে আবার বলছে, বাবা কাকারা, আপনেরা যান, আমার কওয়নের কিছু নাই।

অভয় বুঝল, বাবলি বড় অভিমানী মেয়ে। তার কাছে এখন সব দেশ সমান। সব মানুষ সমান। সে তার ভাল মন্দ টের করতে পারে না। নিতাই থম মেরে দাওয়ার কুড়োলটা হাতে নিয়ে বসে আছে। বর্শাটা সেইভাবে পোঁতা। যেন নিতাইকে ভয় দেখিয়ে গেছে কেউ। তার কলিজা ফুটো করে রক্ত বের করবে কেউ, সেই সংকেত। কুড়োলের দণ্ডে থুতনি রেখে নিতাই অপলক দেখছে বল্লমটা। তার কি কালঘুম পেয়েছিল, যে বেড়ার ওপাশে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, ঘুনাক্ষরে

টের পায় নি। বাবলি যদি পলায়ই তবে আবার ফিরে এল কেন বড় ধন্দ দেখা দেছে মনে

॥ ছয় ॥

মাঠ জমিন, শ্যাওড়া গাছের বন অতিক্রম করে ওরা হিজলের মাঠে এসে নামল। ওরা সোজা পথে গেল না। সোজা পথে গেলেই ধরা পড়বে। পরাণের কলিজা সুপারির ফলায় এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। হাসিম মিঞা পরাণকে নিয়ে বাঁকা পথ ধরল। ঘুরে ঘুরে যেখানে বন জঙ্গল আছে, পায়ে হাটা পথ নেই সেসব দিকে উঠে গেল। দূরে কিছু অমানুষের শব্দ পেল। হৈ হৈ করে গ্রামে ফিরছে। হাসিম বুঝল, ওড়া কোথাও খুন জখমে লিপ্ত ছিল। হাতে রক্তের দাগ। সে পরাণকে নিয়ে ফের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। তারপর কিছুটা সময় পার হলে, সে একাই হেঁটে গেল কিছুটা পথ। দেখল কোথাও কেউ আর আছে কি না! একটা পুরাণো মজা দীঘির ধার ধরে হাঁটছে। বড় প্রাচীন মঠের নিচে দাঁড়িয়ে যখন বুঝল, এ-পথে কেউ আসছে না, তখন পরাণের কাছে গিয়ে ফের ডাকল, অ পরাণ, আছ নি? পরাণ।

পরাণ ঝুপ করে জঙ্গলের মধ্যে ভেসে উঠল।

—ছুটতে পারবাত?

পারাণ কিছু বলছে না।

—আগুইনা বাতাস পার হইয়া যাইতে হইব—পারবাত?

পরাণ কিছু বলছে না।

—হায়রে পরাণ ভাই তোমার বোকা বইনা থাকলে চলব? হোমোদ্দির পুতেরা সুপারির সলা গাঁইথা দিলে আমার ইজ্জত রাখুম

কোনখানে! হাঁট। দৌড়াও। যেন পারলে হাসিম চাবুক মেরে পরাণকে চাঙ্গা রাখতে চায়।

পরাণ দৌড় টৌড় কারে কয় ভুলে গেছে বুঝি। হাসিম ঘোড়ার মত প্রথমে কদম দিতে থাকল। —দৌড়াও দৌড়াও। আরও জোড়ে। দৌড়াও। থাইম না। আ, এডা কি করতাছ পরাণ ভাই। তুমিও মরবা, আমারে-অ মারবা এই কথায় পরাণের বুঝি চৈতন্য ফিরে এল। সে হাসিমের পিছু পিছু দৌড়াতে থাকল। হাসিম তখন বলছে, জায়গাটা ভাল না।

পরগণাতে পরগণাতে দুঃসহ অরাজকতা। উত্তরে আড়াই হাজার, দক্ষিণে আমিনপুর, পুবে পশ্চিমে মহেশ্বরদি, অথবা শীতলক্ষ্যার দুই তীর ধরে ধ্বংশের উল্লাস। মানুষের বড দুর্দিন। হাসিম বলল, আল্লা আপনের নামে এডা কি হইতাছে! আপনের চক্ষু নাই!

হাসিম বুঝতে পারছে উগ্র বিদ্বেষ ক্রমশ এক ভুজঙ্গের মত গোটা অঞ্চলকে গ্রাস করে ফেলছে। যেতে যেতে হাসিম আগের মত বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছিল। কখনও অন্ধকার ঘন, এবং ফাঁকা মাঠ। গাছপালা জনহীন জোনাকির আলোর মধ্যে ডুব সাঁতার দিলে চিৎকার হাসিমের, অ পবাণ ভাই তুমি কি মরনের সুতা কানে বানতাছ! তোমার আক্কল নাই। যেন হাতে পাচন থাকলে বলত, মারমু এক পাচনের বাড়ি, মিঞা নিজের জান আগে। আগে নিজেরে বাঁচাও। এইডা কি! একেবারে য্যান সব গেছে! দৌড়াও দৌড়াও। আমার লাহান পা তুইলা ফেল। বেগবান অশ্ব দেখ নাই। পরাপরদির মেলায় ঘোর দৌড় দেখ নাই। তার কথা মনে আন। হাসিম কথা বলছে আর চারপাশে সতর্ক নজর রাখছে। কারণ পরাণ বেহুস। বোধবাস্তি গেছে। পরাণকে বাঁচাতে না পারলে আল্লার মুখ থাকব না। মানুষের সম্মান থাকে না। হাসিম যত দৌড়াচ্ছে, তত লাঠির ডগায় জাম বাটি চিড়াগুড় দুলছে। যেন মহরমের বাজনা বাজছে ভিতরে। হাসান হোসেন যায়। কারবালায় এজিদ, খাঁ খাঁ মরুভূমি—হাসান হোসেন

যায়—হায় হাসান, হায় হোসেন সেই কবে থেকে তোমরা এজিদের পাল্লায় পইরা বুক চাপড়াইয়া মরতাছ। হায় হাসান, পিপাসার জল নিয়া এবারে তুমি কারে দিবা। মনের মধ্যে কত সব গুনগুনানি চলতাছে সে হাসিম বার বারই পেছন ফিরে দেখছে, সামনে দেখছে, কতটা এগোন গেল, কতটা পেছনে পরাণ পড়ে থাকল।

ওরা গরিপবদির আশ্রমে এসে প্রথমে থামল। আশ্রমের ঘাটলায় বসে দম নিল কিছুক্ষণ। আশ্রমবাড়ির ঘরদোরের একখানাও জানলা কবাট নেই। মায় মঠের ওপর থেকে পেতলের কলসিটাও উপড়ে নিয়ে গেছে। সকাল হতে আর দেরি নেই। গাছপালার ফাঁকে সব স্পষ্ট। পাখ পাখালি আগের মতই ওড়াউড়ি করছে। এ-ডাল থেকে ও-ডালে গিয়ে বসছে। ফর্সা হলেই আকাশে উড়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে নদীর জলে কিছু পাখির ছায়া ভেসে উঠল। পাখিরা উত্তর দক্ষিণে হারিয়ে যাচ্ছে। কাক শালিখেরা টেরই পায়নি কত বড় খুনোখুনি ঘটে গেল এই অঞ্চলে। কাক পাখির চলাফেরা দেখে সেটা আন্দাজ করা যায় না। এত বড় খুনের উল্লাস দিনের বেলাতে আর্শির মত পরিচ্ছন্ন। যেন কোথাও কোন মালিন্য জেগে নেই। চাষ আবাদ হচ্ছে। তামাক ক্ষেতে আল বেধে দিচ্ছে কেউ।

কিন্তু হাসিম টের পাচ্ছিল জলের নিচে তখনও এক অজগর ফুঁসছে। ফাঁক পেলেই ভুজঙ্গ অবলা জীবকে গ্রাস করবে। সে এটা জানে বলেই সঙ্গে রেখেছে জামবাটি, চিড়া গুড় আর একখানা পাতিল। তিন ক্রোশের মত পথ ভেঙ্গেছে। ঘোরাঘুরিতে গেছে আরও চার ক্রোশ পথ। এখন পরানকে নদীতে নামিয়ে দিতে পারলেই বুঝি রক্ষা করা যাবে। নদীটা গেছে বেঁকে বেঁকে। আলিপুরার বাজার পঞ্চমীঘাট পার হয়ে মাঝেরচর। তারপর ক্রোশ খানেক পথ গেলে নাঙ্গলবন্দের বান্নি, পরে আরও ক্রোশ দুই পথ। হিসেবটা সে কড় গুনে করতে গিয়ে বুঝল, আর সময় নাই। পায়ে পায়ে দিনের বেলায় যেতে গেলে পরান হালদার ধরা পড়বে। শুধু নদীর জল ভরসা। জলে নেমে পাতিল

মাথায় রেখে শুধু জলে জলে ভেসে যাওয়া। দেখলে মনে হবে হাওয়ায় একখানা পাতিল ভাইস্যা যায়। গঞ্জে উঠে যেতে তিন ক্রোশেব মত পথ আব। গবমেণ্টেব লোক খবর পেয়ে তাঁবু ফেলে বসে আছে। যারা হেপারে যাবে তাদের চিড়াগুড় দিযে ভুবি ভোজন। সবই আছে নখ-দর্পনে। কৌশলটা মন্দ করে নাই। হাসিমের সাতসকালেই বুক বেয়ে চোঁয়াড়ে হাসি ঠোঁটে ভেসে উঠল। আর মাত্র তিন ক্রোশ পথ টেনে নিতে পারলেই হাসিমেব সম্মান বাঁচে। আল্লার মুখ রক্ষা হয়।

পোড়োবাড়ির মত আশ্রমের বাড়ি ঘর। খাঁ খাঁ করছে। হাসিম পবাণকে ঘাটলায় বসিয়ে জামবাটিতে চিড়া গুড় দিল খেতে। সারা দিনের জন্য পবানকে জলে একটা মৎস্য হয়ে থাকতে হবে। পেটে কিছু না থাকলে ঠাণ্ডায় টাল মেবে যাবে। বড রাক্কুসে হাওয়া বইছে। উত্তুরে ঠাণ্ডা প্রবল। সে বলল, খাও। পরান ভাই খাও।

পরান সাদা চোখে তাকিয়ে থাকলে, কেমন আঁতকে উঠল হাসিম। চোখে চোখ বাখতে পাবল না। সে চোখ সরিয়ে বলল, খাও কি করবা!

সারা দিনের জন্য পরানকে জলে ডুবে থাকতে হবে। পরান পাতিল মাথায় জলে ভেসে যাবে। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াটুকু মুখ ভাসিয়ে পাতিলের নিচে সেরে নেবে। কিন্তু হায় পরানের ভিতর জীবনের কোন চিহ্ন যেন নেই। যেন সব গেছে। শরীর মুখ ফ্যাকাশে। হাসিম পরানেব মাছধরাব হিম্মতের কথা বলল। সিংহদুয়ারি বোয়াল মাছের কথা বলল। তবু পরানের চক্ষু চক চক করে না। সে ভূতের মত বসে আছে। খাচ্ছে না। যেন কেউ ওর মুখে জোর কবে চিড়া গুড় ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হাসিম বসে নজর রাখছে, একবার উঠে গিয়ে দেখে এল কতটা নিরাপদে আছে তারা।

খাওয়া হয়ে গেলে আর দেরি করল না হাসিম। পরানকে পাতিল মাথায় নদীর জলে নামিযে দিল। নিজে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। যেন হাসিম এখন যথার্থ-ই তীর্থযাত্রায় বের হয়ে পড়েছে।

মক্কা মদিনা যাচ্ছে, মানুষের ভালবাসার স্থান, যেখানে মানুষ মানুষের মত, কোন বিভেদ নেই, সবই ঈশ্বরের প্রেরিত, জীব মাত্রেই করুণার যোগ্য—সুতরাং প্রাণধারণে অবহেলা করলে পাপ। হাসিম হাঁটতে হাঁটতে মক্কা যাচ্ছে, মদিনা যাচ্ছে—নিচে শীতের পানি, পানিতে এখন একখানা পাতিল ভাইস্যা যায়। উত্তরের হাওয়ায় পাতিল দক্ষিণে ভাইস্যা যায়। কারো টের পাবার কথা নয় অঞ্চলের একজন মানুষ পাতিল মাথায় নিরুদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

নদীর পাড় ক্রমশ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে যাচ্ছিল। অনেক উঁচুতে হাসিম হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। ফলে হাসিমের শরীরটা জল থেকে মুখ তুললে পরাণ দেখতে পাচ্ছে, বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে। অনেক উঁচু থেকে তবু শব্দ, ক্রমাগত শব্দ—এক দুই, এক দুই। অদ্ভুত শব্দটা জলের নীচে, মনে হয় কোন এক অদৃশ্য পাতাল পুরী আছে, সেখানে রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ঠক ঠক করে যাচ্ছে। অথবা কদম দিচ্ছে ঘোড়া—এক দুই তিন, কদম তুলে ঘোড়া ছুটালেই পরাণের আর ভয় থাকবে না। সে জলের নিচে ডাকছে, কিরণীরে, সুরিনডারে! আমার কি হইবরে সুরিনডা! ছোট মুখ কিরণীর। বড় চোখ কিরণীর। সুরিনডা, জোয়ান বেটা তার। আর ছিল একখানা খেপলা জাল, মাছ মারার জবরদস্ত কোচ। দুইখানা ঘর। ছাগল গরু পায়রা কিরণীর সব পুড়ে গেছে। সেই কিরণী হল্লার মধ্যে কোনখানে যে গ্যাল। সুরিনডার পাত্তা নাই।

নদীর দু-পাড়ে তেমনি গ্রাম মাঠ ফসল। ঝোপে জঙ্গলে টুনি ফুলের লতা। কলমি লতার ফুল ফুটে আছে অজস্র। পাড়ে গাঙ-শালিখের কিচিরমিচির শব্দ। কোথাও দূরে ঘুঘু পাখি ডাকছিল। আজ হাটবার নয়। পাড়ে মানুষের ছায়া তেমন লম্বা নয়। সামনে মাঝের চরের শ্মশান। বড় খালি। কেউ মরা আগলে বসে নেই। আবার সেই এক দুই—ঠক ঠক শব্দ। পরাণ জলের নিচে পাতিলে মুখ জাগিয়ে ভেসে থাকল। অথবা জলের নিচে যেন পরাণ ঝিনুক খুঁজছে।

ঝিনুক, না পরাণ কিরণীকে খুঁজছে। হাতড়ে হাতড়ে জলের নীচে জলার পাশে কিরণীরে খুঁজছে। সুরিনডা যদি লাশ হয়ে গিয়ে থাকে! কিরণীরে তুইলা কেউ নিয়া গেল নাত! অ কিরণী কথা কস না ক্যান, অ সুরিনডা তর বাপত এহনেও বাঁইচা আছে। আমি পরাণ তগ ফালাইয়া কই যাইতাছি।

জলের নীচে পরাণ আবার শব্দটা শুনল এক দুই তিন। অনেক দূর থেকে কেউ সংকেত পাঠাচ্ছে। আর ডর নাই পরাণ ভাই। মাথা তুইলা হাট। জলার উপরে উইঠা, দৌড়াও। পরাণ মুখ ভাসিয়ে ফের দেখল—আহা রোদের সেই কিরণ। সেই তাপ। হাত পা পাড়ে তুলে রোদে সেঁকে নিলে বেঁচে যেত। পরাণ দু-হাতে কচুরিপানা ঠেলে এগুতে থাকল। শক্তি ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে। হাত পা অসার ঠাণ্ডা জলে। হিমের মত উত্তুরে বাতাস উথালপাতাল। সময় বুঝে প্রকৃতিও যেন ক্ষেপে গেল।

পরাণ ভিতরে ভিতরে মরে যাচ্ছিল ভয়ে বিস্ময়ে এবং কিরণীর জন্য, এই টাল ঠাণ্ডার জন্য ওর প্রানশক্তি উবে যাচ্ছে। হাসিম পাড় থেকে তখন গাজীর পীড়ের বায়ানাদারের মত পালা পাঠ করে যাচ্ছে যেন, আর ডর নাই পরাণ ভাই। দামগড়ের কলের চিমনি দ্যাখা যাইতাছে। বড় নদীর পাড়ে আইসা গেছি। বোঠাইন মনে হয় আগে আগে গ্যাছে গিয়া। গেলেই দ্যাখবা বৌঠান তাবু থাইকা বাইর হইয়া আইছে। তোমার সুরিনডা মনে লয় মায়রে লইয়া আগে আগে ভাগছে।

নদীর ফাটল বড় বড়। জলের ঢেউ বড় বড়। পাড় ভাঙছে নদী। পাড়ের মানুষজন বসতবাটি সব হাওয়া। কখন নদীর গর্ভে বিলীন হয় ভেবে বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেছে কেউ। হাসিম জায়গাটা নিরাপদ ভাবল খুব। সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। ফাটল পার হয়ে যাচ্ছে। যত পার হয়ে যাচ্ছে তত হাসিম দেখছে ফাটল ক্রমেই আরও গভীর আরও প্রসস্থ। ফাটলে পড়ে গেলে পাতাল পুরীতে ঢুকে যাবে। কেউ

জানবেই না, হাসিম পৃথিবীতে কোন এক পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিল। সে বড় সাবধানে ফাটল লাফ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে।• মাইলখানেক ঘুরে গেলে পথ। কিন্তু সেখান থেকে নদীর জলে পাতিল ঠিক ভাইস্যা যায়, কিনা চোখে পড়ব না। পরাণ অতদূর থেকে লাঠির শব্দও শুনতে পাবে না। বর্ষাব সময় নদী দু-পাড় ভাঙতে ভাঙতে এগোয়। যা ভাঙ্গে অতলে চলে যায়, যা ভাঙ্গে না, টিলার মত দাঁড়িয়ে থাকে। পরেব বর্ষায় যাবে। হাসিম বলল, কিছুই থাকে না মিঞা। কার লগে লড়ালড়ি। কেমন বিড় বিড় করার অভ্যাস হয়ে গেছে হাসিমের। আল্লাব এই কেরামতিটা ছাখ। কত আশা আছিল তোমার। নদীর পাবে ঘর, নদীর মৎস্য শিকাব। বড আরাম। তবে, আল্লা কাউরে বেকসুর খালাস দেয় না মিঞা। আজরাইল হিসাবের খাতাটা নিয়া বইসা আছে।

পরান বোধ হয় ওর ডাক জলের ভিতর থেকে শুনতে পায়নি। অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়েছিল হাসিম। নদীর পাড় বড় খাড়া। প্রায় যোজন দূরে যেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, হাতে লাঠি, চিড়ার পুঁটলি নিয়ে স্বর্গের রাস্তাটা খুঁজছে। তা খুঁজুক। খুঁজে বের করুক। এই ফাঁকে পরান ভেবে ফেলল যা হবার হয়ে গেছে। আর পারছে না। শরীরে তাপের দরকার। সে বালির চড়ায় উঠে বসে থাকল। এখানটায় মানুষ আসেই না। খাড়া পাড় যখন তখন ভাঙ্গে, হাওয়ায় ভাঙ্গে, জলে ভাঙ্গে। ফলে মানুষ বর্জিত পরিত্যক্ত জায়গাটায় সে কিছুক্ষন হাত পা ছড়িয়ে বসল। আর মাথার অনেক উপরে লম্বা হয়ে আছে ছায়াটা। জলার দিকে তাকালেই বোঝা যায় ছায়াটা হাঁটছে না পথ খোঁজাখুঁজি করছে। পরান হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বালি মাটিতে। শীতের ফসল দেখল। নদীর চরায় যব গমের গাছ, পাশের গ্রাম নাঙ্গলবন্দ। কামার কুমোর একঘরও নাই। সব ভেগেছে। দেব দেবীর মন্দির ফেলে সব ভেগে গেছে। মাটির মূর্তি, ভৈরব ঠাকুরের পূজা হয় পাঁঠা বলি হয়, বোধ হয় আর কিছুই নেই। দেব দেবীর মূর্তি খড়ের 'গাদার মত

পড়ে আছে। দূর থেকেই পরান টের পেল সেই এক আলিসান ভুজঙ্গের কাজ। মানুষের মধ্যে, ফুসকরির মত জেগে থাকে। তারপর কখন যে সেটা বিষফোঁড়া হয়, পাকে গলে, দুর্গন্ধ ছিটায়! আর তখনই অনেক উঁচু থেকে সেই শব্দ, ঠক ঠক। ভয় ভয়। আর সঙ্গে সঙ্গে পরান ব্যাঙের মত জলে লাফিয়ে পড়ল। বিষফোঁড়া পাকে গলে কে কয়। জীবনের চেয়ে অমূল্য ধন আর কিছু নাই। পরান ব্যাঙের মত জলের মধ্যে ডুবে গেল।

হাসিম যেতে যেতে দেখল, দু'জন অমানুষ সুপারির শলা নিয়ে কলাগাছে হাত মকস করছে। তখনই শব্দ পাঠাল টরে টক্কা। ভয় ভয়। নদীর এত খাড়া পাড় ধরে কে যায়। এক মনুষ্য যায়। আপথে কুপথে গেলে সন্দেহ বাড়ে। কলাগাছ থেকে শলাটা তুলে অমানুষেরা দাঁড়িয়ে আছে। কে লোকটা! কোথায় যায়! দূর দিয়া যায় ক্যান। পালাইতেছে। হান্দাও একখান সুপারির শলা পেটে। দুই অমানুষ হাসিমকে ধরার জন্য যব গমের খেতে ঢুকে গেল। হাসিম প্রথমে কি করবে ভেবে পেল না। সেত ভাইভাই। দরকার হলে উলঙ্গ হয়ে দেখাবে। সে খুব সাহসী মানুষের মত লাঠি ধর করে দাঁড়াল। আসুক।

কিন্তু মানুষের কত রকমের সখ হয়। ওরা খোঁচা দিল একটা হাসিমকে, মিঞা কই যাও?

বাবলি দেখল, পুলিশ খোঁচা মারছে গোঁসাইরে। ব্যাটন দিয়া খোঁচা মারছে। বাবলি মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। সেই কবে থেকে খোঁচাটা হাসিম মিঞা খায়, ঠাকুরবাপ খায়, গোঁসাই খায়।

বাবলি বলল, খোঁচা মারেন ক্যান। হ্যায় কি আপনেগ বাড়া ভাতে ছাই দিছে।

—দিছে দিছে, বলে খুক খুক করে হাসতে থাকল দুই অমানুষ।

—কি দিছে!

—তর কপাল দিছে। তরে নিয়া খুব গণ্ডগোল। তুই কার সঙ্গে পালিয়েছিলি?

—পালালাম!

—হ্ ভাগ্যিস বড়বাবুর লোক নজর রাখছিল। কে ভাগে কোন দিকে ভাগে সব ত নজর রাখতে হয়।

—মিছা কথা!

—বড়বাবু ডাকলেই বুঝতে পারবি।

সকালে পুলিশ গিয়ে তুলে এনেছে তাদের। অভয় খুড়োকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। বল্লমটা উঠোনে এখনও গাথা আছে। নিতাই সেটা ছুঁয়েও দেখেনি। কেবল ঘরে ঢুকে দেখেছিল, সাদা মত কিছু গুঁড়ো পাউডার পড়ে আছে। কেমন বিদঘুটে গন্ধ। হাত পা গুলিয়ে উঠেছিল। জয়নগরের সব মানুষজন বুঝতে পেরেছিল, বাবলির ওপর কারো দয়া হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধির মত, বাবলিকে ভয় পেতে থাকল সবাই। কারণ এখানে পুলিশের হয়ে কেউ না কেউ খবর পাচার করে দিচ্ছে। দুটো ভাল কথা বললেও মন্দ হয়ে দেখা দিতে পারে। অভয় খুড়োর খোঁজ নেই—সেটা আরও ভয়ের।

নম্বর ধরে ডাক পড়ছল। বাবলি তার নম্বর জানে না। সদর রাস্তা সামনে। গরুর গাড়ি যায়, বাবলি বসে বসে দেখে গোঁসাই গোঁজ হয়ে বসে আছে। সন্দ ঢুকে গেছে গোঁসাইর মনে সেদিন থেকেই গোঁসাই গোমড়া মুখ করে রেখেছে। ভাল কথা একটা বলে নি। একই উঠানে, একই ঘরে বাস তবু যেন মানুষটা কত দূরের হয়ে গেছে। বাবলির অভিমান বড় বেশি। একবার বলেছিল, গোঁসাই তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমারে সন্দ কইর না। বাঁচি মরি তোমার লগে আছি। চোখ টলটল করাছল বাবলির। এখানে এসে সন্দটা আরও পাকা হচ্ছে। বাবলি কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এত করে বলল, চল চইলা যাই। মা জননীর কোলে কত জায়গা জমিন, কত মানুষজন। দু'জন

মাইনসের ঠাঁই হইব না! কিন্তু গোঁসাইর এক কথা! বাপ দাদার দেশ ছাইড়া কোনখানে যামু না। তা মরতে চাইলে—আমি কি করতে পারি।

সারবন্দি লোক। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এটা হামেসাই হয়। এই নিয়ে কতবার যে ধরে আনল। মুচলেকা দিয়ে চলে যেতে হত। তারপর আবার যে কে সেই। বাবলির মনে হল, আজও আবার লিখিয়ে নেবে, লিষ্টি মিলিয়ে টিপ ছাপ। কিন্তু শেষে যা হয়, কেউ নড়ে না। সদরে খবর যায় অন্যরকমের। জোর জবরদস্তিতে কাজ হচ্ছে না। পুলিশের লাঠি আর জনগণ গ্রাহ্য করে না। চূড়ান্ত বিহিত একটাই। সময়সীমা বেঁধে দেওয়া। তাও হয়েছে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে লঞ্চে উঠে গেছে। বেশির ভাগই যায়নি। এই নিয়ে কতবার সময়সীমা যে বাড়িয়ে দিল। মনীন্দ্র, কালীপদরা ভেবেছে, সময়সীমা বাড়তে বাড়তে এক সময় সব ঠিক হয়ে যাবে। গরমেণ্ট বুঝতে পারবে এরা ঘাড়ে বসে খেতে আসেনি। এরা সব পারে। গরমেণ্ট ক্ষমা করে দেবে। মুক্তি। তখনই মুক্তি। তখনই স্বাধীনতা। ছৈলছকুরী করতে হইব না। বনের কাঠ এনে বেঁচতে হবে না। যা জমা জমিন আছে, ঘেরি আছে তাতে করে মানুষজনের চলে যাবে। ঘরের মানুষ, ঘরে বসতি চাইল তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কি থাকতে পারে।

বাবলির বসে থেকে কোমর ধরে গেল। পেট জ্বলছ খিদেয়। গোসাই ঘাসে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মানুষজনের ভিড়, ঠেলাঠেলি। বেলা বাড়ছে। এক এক করে চলেও যাচ্ছে। বাবলি দেখল রঘু দাস দৌড়ঝাপ করে বেড়াচ্ছে। হাতে একখান লিস্টি। বাবলির কাছ দিয়ে ক'বার ঘুরেও গেছে। যেন দেখাতে চায় তার সঙ্গে নেতাইর কত তফাৎ বাবলি একবার বুঝুক। চোখে জ্বালা থাকলে যা হয়, বাবলি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, ধম্মপুত্তুর।

লিস্টি মিলিয়ে হাঁক আসছে। বাবলি কান খাড়া করে শুনছে। পুলিশ বাবারা এখন রাস্তায় লাঠি বগলে। তার সঙ্গে মসকরা করছে

না। তাকে বড়বাবু ডাকবে। —কেন ডাকবে! লোকগুলি কি সত্যি বড়বাবুর লোক। আসলে বড়বাবুর নাম বলে ভয় দেখায়নি ত! মানুষের মনে কত রকমের কুবুদ্ধি থাকে। সে কাউকে না বললেই পারত, শনে পিসিকে সন্দ না করলেই পারত। এখন সাত পাঁচ কান হয়ে বড় বাবুর কাণে কথাটা কি-ভাবে উঠেছে কে জানে। ভয়ে তার বুক ধুকধুক করছিল।

সামনে সেই রাস্তা, পেছনে খাল, একটা বড় মাঠে কাঁটাতারের বেড়া। লোকগুলিকে সব কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু কিছু খালি হচ্ছে। দু'জন করে পুলিশ বাব, সঙ্গে যাচ্ছে। যেন ঘরে ফিরেই মতটা বদলে ফেলতে না পারে। বড়বাবু সখারামের কত দায়।

সখারাম আসলে তখন মাঝখানে তাঁবুর নিচে। পর পর সারি সারি তাঁবু। তাঁবুর মধ্যে অস্থায়ী অফিস কাচারি। তার লোকজন কাজকর্ম করছে। ফাইলের পাহাড় সামনে। মাঝে মাঝে মুখে পান ফেলে দিচ্ছে। কাচা পাকা চুল, দক্ষিণা বাতাসে চুল উড়ছে। বেশ শক্ত মজবুত শরীর। তবু হাতে তাগা বাঁধা। গলায় ঢোলের মত তাবিজ। লম্বা জামার নিচে সব লুকিয়ে রাখার স্বভাব। পাকা লোক, বেশি তাবিজ কবজ দেখলে সম্মান করে না ভদ্রজনেরা। আর এরা ত ইতর লোক। কি যে ফ্যাসাদে ফেলল। উপর থেকে একের পর এক হুড়কো আসছে। এবারে চরম নির্দেশও এসে গেছে। সে আর পি'র একজন বড় গোছের কর্তা আসবে লঞ্চে। সখারামের কপাল ঘামছিল। ঘামে বুক পেট ভিজে গেছে।

বাবলি শেষে আর পারল না। নিতাইকে বলল, গোঁসাই দেখি বড়বাবু ক্যান ডাকে।

নিতাই উঠে বসল। —যাইবি?

—হ যাই।

সখারাম বাবলিকে বড় ভাল চেনে। শনে পিসিই কাজ কম্মের

ধান্দায় নিয়ে এসেছিল। দেড় দু বছরে মেয়েটা বড় বেশি বাড়বাড়ন্ত হয়ে যাবে সখারাম বুঝি বুঝতে পারে নি। একদিন নদীর পাড়ে দেখা। তখন জ্যাঠার দু-পয়সা আয় হচ্ছে। খাওয়া পরার ভাবনা কম। বাবলি আর কামের ধান্দায় ঘোরাঘুরি করে না। দেখেই বলল, আরে, বাবলি যে।

এক মাথা ঘন চুল। ডুরে শাড়ি পরনে। হাত পা বড়ই পুষ্ট। যৌবন যেন জলে ভাইসা যায়। সখারাম বাবলিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। দাঁতে শূল ব্যাথাটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে। কামড় বসাবার প্রলোভনে বলল, শনে পিশির সঙ্গে আছিস। নিতাইবে দেখি কোথাও কিছু কবে দিতে পারি কিনা।

বাবু মানুষ, প্রভাব প্রতিপত্তিও আছে। গোঁসাইর কাজ হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সে শনে পিসির সঙ্গে মাঝে মাঝেই ক্যাম্পে চলে আসত। বাবুর চাটা করে, পানটা সাজিয়ে দিত। শনে পিসি তাঁবুর বাইরে কাজ করে। মন্দ চলতনা। কিন্তু একদিন কি হল বাবুর, বুঝি মাথা গরম হয়ে গেল, খপ করে হাত ধবে বলল, কাছে আয় না।

— না বাবু।

— আয় বলছি।

— না বাবু।

— কিছু করব না। আয় না।

— না বাবু পায়ে পড়ি।

তবু শোনেনি সখারাম। বাবলি পা ছেড়ে হাত কামড়ে ছুট লাগিয়েছিল। সেই থেকে বাবু চটে আছে। কিছু হলেই বোঝে সখারাম তলে তলে কাজটা করছে। অঞ্চলের খারাপ মানুষেরা দায়ে অদায়ে সখারামের কাছে আসে। তারা বড় বান্দালোক সখারামের। সর্বত্র সখারামের চর। মানুষের চোখে কু-ভাব দেখলেই বাবলির কেন জানি মনে হয় এ সখারামের লোক না হয়ে যায় না।

বাবলি দেখল, বড়বাবুর কাছে যাওয়াই কঠিন। কত সব লোক

বড়বাবুর কাছে যেতে চায়। ভিড় ঠেলে সে তবু কোনরকমে ঢুকতে গেলে কেউ যেন ওর শাড়ি ধরে টানল। —কেডা ?

—কোথা যাচ্ছিস ?

—বড়বাবুর লগে দেখা করমু।

—ডাকছে ?

—না।

—আস্পর্দা ত কম নয়।

বাবলি এবার ঢংয়ের কথা ছুড়ে দিল। সে এই বয়সেই ইচ্ছা করলে কোমর ছুলিয়ে কথা বলতে পারে। নাগরের মত সবাই, কে নেবে গো, আমি বাবলি দাসী। বুক উঁচিয়ে, গাল লেপ্টে কথা বললে সব মরদ এক রকমের। পেলেন ডেবেসের পুলিশ। বাবলি চোখ মটকাল, মুচকি হাসল। তারপর ঠোঁট টিপে ঢঙ্গি হয়ে গেল। তখন পেলেন ডেবেসের পুলিশ বাবা কাৎ। —যাবি যা, কিছু বললে আমি জানি না।

বাবলি দেখল একটা টেবিল ফ্যান ঘুরছে পেছনে। সামনের টেবিলের চারধারে যারা এলাকা জুড়ে নয়া বসতি করেছে তাদের মোল্লা মাতব্বরেরা ঘিরে রেখেছে বড়বাবুকে। সেই সুমার এলাকা বাবলির ঠিক চেনা জানা নয়। সে চেনে বিদ্যাধর নদী, বড় বটবৃক্ষ, লঞ্চের ঘাট, আর নদীর চরা। ভেতরের দিকের বনজঙ্গলও সে কিছুটা চেনে। এই লোকজনদের সে চেনে না। জয়নগরের এরা কেউ নয়। পুলিশ ক্যাম্পের সবচে কাছের জায়গা জয়নগর। তাও এক ক্রোশের মত পথ। নদী পার হয়ে আসতে হয়। সে তখনই দেখল বড়বাবু গলা তুলে কি দেখছে। তার কপালে ঘাম। খুব তিক্ত মুখ। বাবলি কোনরকমে মানুষের ভিড়ের মধ্যে কচ্ছপের মত গলা বাড়িয়ে দিল।

—আরে বাবলি !

—হ বাবু। বইসা আছি। কখন ডাক পড়ব।

—বসে আছিস কেন, বাড়ি যা।

কত সুন্দর কথা বলে বড়বাবু।

বড়বাবু ফের ডাকল, এই শোন ?

বাবলি গলা বাড়িয়েই রাখল।

—নাম লিখিয়েছিস ?

বাবলি কি ভেবে বলল, হ বাবু।

—ঠিক আছে যা।

বাবলি আর নিতাই ফিবে এসে বসতে না বসতেই শনে পিসি চলে এল। রাস্তা থেকেই ডাকছে, অ বাবলি বাড়ি আছস ?

—আছি পিসি।

—তরা যাইবি গিয়া শুনলাম।

নিতাই কুড়ুলে ধার দিচ্ছিল। হাতে কাজ কাম কম। বনে কাঠ কাটতে যাওয়া যায় না। পুলিশের অত্যাচার বেড়েছে। নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া যায় না। পুলিশের অত্যাচাব বেড়েছে। সুতরাং কি করা, ফাঁক পেলেই কুড়ুলে ধার তোলে। আর মাঝে মাঝে আঙুলটা জিভে ঠেকিয়ে ধার দেখে। কখনও ছুটে যায় হাক পেলে। যে হাকাড় দিত, সে নিরুদ্দেশ। কোথায় আছে কেউ বলতে পারছে না। অভয় খুড়োর বিধবা বোনটা সকালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছিল। ফলে আর হাকাড়ও নেই ছুটে যাওয়াও নেই।

বাবলি বলল, হ যামু গিয়া।

—নিতাই অবাক হয়ে বলল, কই যাবি বাবলি !

—তুমি জান না গোঁসাই। মাথায় কাঠের কাকুইয়ে চুল আঁচড়াতে থাকল বাবলি !

—তর মতি গতি বুঝি না।

শনে পিসি অবাক। বাবলি কি তবে একা নাম লিখিয়েছে ! বাবলি কি টের পেয়েছে, বাঘে ছুলে আঠার ঘা। পুলিশের হাতে কামড় ! জল কতদূর গড়ায় বুঝতে পেরেই সটকান দিচ্ছে।

শনে পিসি বলল, তা যাইবি না, থাকবি কি কইরা ! সবাই চইলা যাইব। তরা থাকবি কি কইরা।

—না সবাই চইলা যাইব না পিসি। নিতাই কুড়ুলটা ঘরে তুলে রাখল।

—ঐ কথা। সব কি যায় রে! বনে জঙ্গলে কত পালাইব দেখিস। ট্রাকে জোর কইরা উঠাইব, রাস্তায় দেখব পাতলা হয়ে গ্যাছে ট্রাক। মানুষ ত আর গরু ঘোড়া না। বাইন্দা বাখলেই বান্দা থাকব।

নিতাই কোমবে বাধা গামছাটা খুলে কপাল মুছল। বড় গরম দিচ্ছে। সে ঘাম মুছে বলল, কিছু মানুষ, গরু ঘোড়াই পিসি। আর কিছু মানুষ গিরস্থ। আমরা গরু ঘোড়া, বড় বাবু গিরস্থ। তা তুমি কি জন্যে আইলা অবেলায়।

—আইলাম তগ দেখতে। দেশের মানুষজনরে দ্যাখতে ইচ্ছা যায় না। চইলা যাইবি! তর বাপ কি মানুষ ছিলবে একখানা।

—বাপরে বড় বাবুই মারছে।

—মাইনসের কথায় কান দিস না নিতাই। মাথা গরম কইরা বিপদ ডাইকা আনস ক্যান। তারপর শনে পিসি খুব সতর্ক নজর রেখে চারপাশে কি দেখল, শেষে ফিস ফিস করে বলল, কাল নুটিশ দিব। ঘর বাড়ি ছাইড়া যাওনের নুটিশ। সি আর পি আসব। বড় বাবুর দিন রাইত মাথা গরম। এই মানুষটা আছিল বইলা দেড় দুই বছর কাটাইয়া গেলি। তার নামে মিছা কথা কইলে ভগবান সহ্য করব না।

বাবলি বলল, তুমি অ পিসি আছ। গোঁসাইর মাথা গরম আছে জান। অরে তুমি ক্যান যে বড়বাবুর কথা কও।

নিতাই দেখল সূর্য বিদ্যাধরী নদীতে হেলে পড়েছে। ফিরে এসে দু'জনে দু জামবাটি পান্তাভাত খেয়েছে। লেবুপাতা শুকনো লংকা পুড়িয়ে পান্তাভাত। দু'জনের শরীরই অলস। সূর্যের গনগনে আঁচ সারা দিন। বৃষ্টি হবে হবে করেও হচ্ছে না। নদীতে জোয়ার উঠে আসছে। ফুলে উঠেছে জল। এবং বর্ষায় এই সময়টাতে সবুজ এক আভা চারপাশে। গাছ লতা মধু আর ফুলের গন্ধ মিলে এই পৃথিবীর এক নায়ক নিতাই। বাবলির মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

গোলমেলে কথাবার্তা কয়। তার সহ্য হয় না।

বাবলির বড়বাবু প্রীতি নিতাইকে বড়ই অসহিষ্ণু করে তুলছে। দেবে নাকি ঘাড়ে একটা কোপ। সব ঝামেলা চুকে বুকে যাক। ঠাকুর বাপ চেয়েছে গাছ পালা উঠোনে শেকড় চালিয়ে দিক, বাপ চেয়েছে, সেও তাই চায়। বাবলি না থাকলে সে কার জন্য গাছ পালাব মত মাটিতে শেকড় গেঁথে দেবে। সে যদি চলে যায় তার থাকলটা কি! সে বাবলির ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক করছস তবে চইলা যাবি।

— যামুনাত খামু কি!

শনে পিসির মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চুলে কদম ছাট। গলায় কন্ঠি। সায়া ব্লাউজ পরে না। সাদা ধুতি পেচিয়ে পরেছে। ছেলেরা একজন মুদির দোকান করে গঞ্জের হাটে, অন্যজন পুলিশে গেছে। বড়বাবু এইসব করে দিয়েছে। কৃতার্থ শনে পিসি এখন বড়বাবু যা কয় তাই শোনে। নুণ খেলে গুন গাইতে হয়। শনে পিসি যা বলে, বাবলির তা বলা উচিত নয়।

—তালে যা, যেদিকে চক্ষু যায় চইলা যা। নিতাই ক্ষেপে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। শনে পিশি ভাবল কুড়ুলটা নিয়ে আসছে নাত! কেমন শংকায় মুখ শুকিয়ে গেল। তবু শেষ কথাটা না বলে গেলে নয়, সে বলল, বাবলি তরও মাথা গরম আছে। নিতাই না গ্যালে তুই যাইবি ক্যান? বড়বাবুত বলছে, থাকনের বিহিত তাইনই বাতলাইয়া দিব।

—শুনতাছ গোঁসাই! বাবলি উঠোন থেকেই ঘরের উদ্দেশ্যে কথাটা বলল।

নিতাই ঘরের ভেতর থেকেই বলল, পিসি বাবলিকে জিগাও যে তারে তুইলা নিছিল কে?

এই কথায় বাবলির মুখটা চুন হয়ে গেল। তাঁর হুঁস ছিল না তখন। চোখ কেমন জড়িয়ে আসছিল। আর যখন হুঁস হল, তখন দেখার সময় পায় নি। আতঙ্ক বুকে। অন্ধকার বনজঙ্গলের মধ্যে

নদীর জলায় নাও। তার মাথায় উকুনের কামড়ের মত জ্বালা। কেমন বেহুঁস বমণীব মত জলে ঝাপ দিয়ে পড়েছিল! অন্ধকারে টের করতে পারেনি কতদূরে বাবলি ভাইসা যায়।

শনে পিসিই গলা খাকারি দিয়ে বলল, মাথায় উপরে কেউ না থাকলে এই হয় নিতাই। মাথার উপর গরমেণ্টও নাই। বিচার দিলে তোমার বিচার কে নিব কও। দুষ্ট লোকেরা সাহস পাইব না। জলা জঙ্গল জায়গা। ঘুইবা বেড়ায় তেনারা। চোখ পড়লি ছাড়ব ক্যান! শবীল বলে কথা! অবলা পাইছিল, ধইরা নিয়া গ্যাছে।

নিতাই মাচানে হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে। কুড়ুলটা কোনায় বাখা। গোল-পাতাব চাল, মুলিবাঁশের বেড়া। বাপ বড় যত্নে এই ঘরবাড়ি তুলেছে। বাপ জানত, আব কোথাও যেতে হবে না। তখনও গবমেণ্ট থেকে এত চাপ আসে নি। ঠাকুর বাপ থেকে তার কেবল ঘববাড়ি বানিয়ে দিন গেল। সেই কবে থেকে যেন যাযাবর জীবন তাদেব শুরু হয়েছে। পারুলকোটেও বাবা দু তিনবার জমি জায়গা বদল করেছে। সমবৎসবেব খোরাকি, একটু জলা জায়গা, মাছ মারার নেশা বাপকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। সেও সেই নেশায় এখন এই ঘববাড়ি ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু শরীর জ্বলছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। বঘুদাসেব লোকেবা সবাইকে বোঝাচ্ছে। কাঠের পেটিতে আবার তোলা হচ্ছে সব। আয়না কাকুই এনামেলের হাড়ি থালা বাসন সব বাক্সবন্দী হচ্ছে। সে বাড়ি ফেরার সময়ই দেখেছে। সে যে কি করবে!

এই সব সাত পাঁচ ভেবে বাইরে বের হয়ে দেখল বাবলি শনে পিসি কেউ নেই। সে ঝিম মেরে কতক্ষণ পড়েছিল মাচানে বুঝতে পারছে না। শনে পিসি বাবলিকে নিয়ে কোথায় গেল! যাবার আগে একবার বলে গেল না! বাবলি কি, না, সে আর ভাবতে পারছে না। ঘরে ঢুকে আবার কুড়ুলটা কাঁধে নিয়ে বের হয়ে গেল। সে জানে, এই তার সম্বল, মরে বাঁচে এটা সে সারা জীবন ঘাড়ে বয়ে বেড়াবে।

॥ সাত ॥

—আল মরা ব।

—হাত ছাড়। বমু না। কি কথা আছে কও।

—মাথাডা ঠাণ্ডা কর। বড় গুহ্য কথা আছে।

—তোমার গুহ্য কথা দিয়া আমার কাম নাই। উঠানে বাইর হইয়া না দেখতে পাইলে গোঁসাই ক্ষেইপা যাইব।

শনে পিসি হাতটা তখনও শক্ত করে ধরে আছে। বাড়ির পেছনে গভীর গেও গড়ানের জঙ্গল। শাপ খোপ, বাঘের উপদ্রব সবই আছে। পিসি কথা বলতে বলতে খপ করে বাবলির হাতটা ধরে ফেলেছিল।— আল মরা আয়। আমি সাপ না বাঘ, খাইয়া ফেলমু না। গোপন কথা আছে।

—কি কথা ?

—এখানে কওয়ন যাইব না। কে কোনখান থাইকা শুনব।

—পিসি তারপরই টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে টেনে এনেছে। বাবলির মনে সন্দ, বড় বাবুর লোক তারা নাও হতে পারে। বড় বাবুতো আজ তার সঙ্গে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে। বড় বাবু যদি সত্যি দয়াবান হয়। শনে পিসির আর অভাব নেই। পেট ভরে খেতে পায়। এসব ভাবতে ভাবতে সে এতটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। এখন যদি গোঁসাই গলা ফাটিয়ে তার নাম ধরে ডাকেও সে শুনতে পাবে না। এমন ভাবতে গিয়েই বাবলির ভয় ধরে গেল। শনে পিশি হাত ধরে টানলেও আর জঙ্গলের মধ্যে সে ঢুকতে চাইছে না। কেমন শক্ত হয়ে গিয়ে বলছে, হাত ছাড় পিসি। কি কথা আছে কও। আমি আর জঙ্গলের মধ্যে যামু না। না দেখতে পাইলে গোঁসাই ক্ষেইপা যাইব।

তখনই শনে পিসি বলেছে, আল মরা ব না।

—না যমুনা পিসি। সাঁজ লাইগা আছে? গোঁসাই না দেখতে পাইলে ক্ষেইপা যাইব।

—তর যে কথা। তুই অর কে ক?

—আমি অর সব পিসি।

—তা যখন সব, শোন, বড় বাবুর লগে গিয়া দেখা কর। ভাল চাষ ত কর। তগ ভাল চাই বইলা খোঁড়া পা নিয়া আইছি। বলেই শনে পিসি হাঁটুতে হাত দিয়ে বসে পড়ল, আ কি কষ্ট ল! চিড়িক চিড়িক কইরা ওঠে। কি যে হইছে এখানটায়। বলে কাপড় তুলে হাঁটু দেখিয়ে শনে পিসি বাবলির ভেতরের ভয় দূর করতে চাইল। আর শনে পিসি বোঝেও না, মাইয়াটার এত ভয় ক্যান। মাইয়া মানুষরে কেউ না কেউ খায়? তার পার পাওয়নের উপায় আছে! নিতাই খাইলেয় খাইব, বড়বাবু খাইলেয় খাইব। আর খাওয়ন নিয়া যখন কথা, তখন বড় মাইনষের হাতে পড়াই ভাল। যেমন খাইব তেমন দিব!

শনে পিসি বলল, তুই যাইতে চাস ক্যান, নিতাইত যাইব না কয়।

—তার মাথা ব্যাথা আমার মাথা ব্যাথা এক না পিসি।

—এই যে কইলি নিতাই তর সব। অয় যদি না যায়। তুই একলা—কোনখানে গিয়া মরবি।

বাবলি কি বলবে ভেবে পেল না। সে বুঝতে পারে জয়নগর, কচুখালি, হাটখোলার লোকজন কেউ আর স্বস্তিতে নেই। গাছ পালার নিচে কেবল জটলা। উড়ো খবর আসছে। ঘরে ঘরে বল্লম কোচ একহলা। রঘু দাসের বাপ, সবাইকে অন্যভাবে ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে, অভয় মোড়ল তোমাগ মারতে চায়। শুকিয়ে মারতে চায়। রাস্তাঘাট বন্ধ কইরা দিছে গরমেণ্ট। দু দিন বাদে এক রতি অষুধ পত্র আসব না, চাল ডাল আসব না। খাইবা কি! কিন্তু সে সব করেও রঘু দাসের বাপ জয়নগরের লোকদের টলাতে পারে নি। গাবের কস খাওয়া নৌকা, কোন খাল থেকে খাড়িতে পরে চাল ডাল তেল নিয়ে আসে। মহাজনরা তার খবর রাখে। গরমেণ্ট সব বন্ধ করে দেবার পরও গোঁসাইর

নৌকায় মাছ। সেই মাছ চালান যায়। খাদ্য আসে। তারপর নোটিশ পড়বে। উচ্ছেদের নোটিশ। ওরা মরবে। যেন দৃশ্যটা দেখতে পায় বাবলি। ঘরে ঘরে আগুন। আর অমানুষদের গন্ধ। কোন অন্ধকার থেকে কে হাত বাড়িয়ে নিমেষে তাকে তুলে নেবে। গোঁসাই টেরও পাবে না। এই ভয়টাই বাবলির। অভয় খুড়োও নাই। তারে কোন জঙ্গলে কারা লাশ বানিয়ে দিয়েছে, তার খবর কে রাখে। বাবলি খাতায় নাম লেখাতে চায়, কিন্তু গোঁসাই চায় না। বড়বাবু বলতেই মনে কি এসেছিল, বড়বাবু খুশি হলে গোঁসাই রক্ষা পেয়ে যাবে বলেই যেন মন রাখতে বলা, হ লেখাইছি। আসলে সে কিছুই করেনি। গোঁসাই না লিখালে সে লেখায় কি করে!

—না পিসি আমি যাই। তুমি হাতখান ছাইড়া কথা কও!

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে গাছপালার ফাঁকে দুটো একটা তারা উঁকি মারছে। এই বন জঙ্গলকে বাবলির বড় ভয়। এমন নিঝুম যে পাতা খসে পড়লেও টের পাওয়া যায়। মস মস শব্দ কানে আসে। কেউ যেন চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে। এক আতঙ্ক সব সময়। সে এবারে প্রায় হাতখানা জোর করেই ছাড়িয়ে নিল। তারপর এক দৌড়। বন জঙ্গলের মধ্যে যেন এক ভীত হরিণী দৌড়ায়। শনে পিসি শুধু বলল, আবাগি। কপালে না থাকলে সুখ সইব ক্যান। যা মর গা।

বাবলি বাড়ি ঢুকে দেখল, কেউ নেই। দরজা খোলা। সে ডাকল গোঁসাই। গোঁসাই তুমি কই গ্যালা। আমি যে বড় মন্দ বাতাসের মধ্যে আছি গোঁসাই। তুমি আমারে একা রাইখা আর যাইয় না।

বাবলি বুঝল চেঁচামেচি করে লাভ নেই। বাড়ির পাশে যে সব মানুষের বসতি আছে তাদের কাছে খবর দিতে হবে, কোথায় গেল মানুষটা! রাস্তায় নেমে যেতেই কৌশলার সঙ্গে দেখা। বলল, এই কৌশলা শোন।

কৌশলা কাছে এলে বলল, গোঁসাইরে দেখছস?

তাইন ত কুড়াল ঘাড়ে কইরা আচার্য পাড়ার দিকে গেছে।

বাবলি দেখল, ছোট ছোট খুপড়ি ঘরে এখন কুপির আলো জ্বলছে। গেণ্ড গরানের বন থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। মানুষটা তাকে ডাকাডাকি করেছে নিশ্চয়। সে না বলেকয়ে শনে পিসির সঙ্গে গিয়ে ভাল কাজ করেনি। আসলে সে কি করে যে গোঁসাইরে রক্ষা করে! শেষ পর্যন্ত সে টের পায়, অভয় খুড়োর মত গোঁসাইরেও কেউ না কেউ নিরুদ্দেশে পাঠিয়ে দিতে পারে। সব জায়গায় বড়বাবুর লোকজন। এমন অপদেবতার কোপে পড়ে যাবে, বাবলি জীবনে ঘুণাক্ষরে ভাবেনি। মানুষটার কি মাগ ছেলে নাই? মানুষটার কি ভগবানে ভয় নাই? পাপ ত বাপেরেও ছাড়ে না। গোঁসাই যা একখান মানুষ। কবে না জানি কুড়ালের এক কোপে বড়বাবুর মুণ্ডুটা নামাইয়া দেয়।

এই সব ভাবতে ভাবতে বাবলির উপরের পাটির দাঁত নিচের পাটিতে চেপে বসল। মানুষ আশ্রয় চায় ভগবান। তুমি কও, আমাগ কি দোষ। আমরা ক্যান জায়গা জমিন পাই না। আমরা ক্যান শুকা বাতাসে জ্বইলা মরি। ধীরে ধীরে বাবলি চোখে এক ঘন সুন্দর স্বপ্ন দেখে। —যেন বাবলি বসে আছে, ছোট্ট এক টিন কাঠের ঘরে। গোয়ালে গরু হাম্বা হাম্বা করছে। মানুষটা গেছে বর্ষায় জোয়ারের জলে সরপুঁটি ধরতে। আকাশ ধরণী মিলে বৃষ্টির ধারায় ঝাপসা। গুম গুম শব্দের মধ্যে এক সুজলা সুফলা ধরণীর স্বপ্ন বাবলির চোখে মুখে। —তুমি গোঁসাই কই গ্যালা।

পাতকুয়ার পাশে বড় গরান গাছটার নিচে মানুষের জটলা। অন্ধকারে মানুষের মাথা গিজগিজ করছে। গাছের নিচে একটা মশাল জ্বালিয়ে কালীপদ বৃন্দাবন যতীন্দ্র দাঁড়িয়ে। আর বসতির লোকেরা ঘিরে কি শুনছে। উত্তেজনায় সবার মুখ থম থম করছে। বাবলি ভাবল, ওখানেই তাইন আছে। সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে বলল, গোঁসাই নাই?

সেই মেয়েটা। বাবলি। প্রতিমার মতো নাক মুখ।' ডাগর

চোখ। শ্যামলা রঙ। নাকে নথ দিলে আর রঙটা আর একটু মাজা ঘসা হলে দেবদেবীর পুণ্যি ঘরে উঠত। এই মেয়েটাবে নিয়ে কত কথা হচ্ছে। কেউ বলেছে, বাবলি, ভাগতে চেয়েছিল। কারণ আজকাল যেন পৃথিবীর তাবৎ মানুষরা টের পেয়ে গেছে, দুষ্কার্য করতে চা'ও বিন্ধ্যাধবীর পাড়ে যাও। সহায় সম্বলহীন কাকে বলে দেখতে পাবে। গরমেণ্ট পর্যন্ত এক-ঘরে করে দিচ্ছে তাবৎ মনুষ্য সমাজটাকে। তাতেও বেহাই নেই। উচ্ছেদের নোটিশ দেবাব জন্য এক ব্যাটেলিয়ান সি আব পি আসছে। কে জানে, কি কথায় কোন কথায়, পুলিশের পেটে বল্লম ছুঁড়ে দেবে। আগে থেকে গরমেণ্ট পাকা বন্দোবস্ত করে রাখছে।

ভিড়ের মাঝখান থেকে কে যেন বলল, নেত্তাইরে খুঁজছ?

—হ।

—সেত কুড়াল ঘাড়ে নিয়া পুলিশ ক্যামপের ঐদিকে গেল।

—ক্যান গেল, কিছু কইল না?

—না কিছু কইল না।

মিটিন না কইরা চইলা গ্যাল! মানুষটাত মিটিনের একজন মোল্লা। দিন নাই দুপুর নাই, নিতাই আছ নি! গোঁসাই যেন পা বাড়িয়েই থাকে। হাত উঁচু করে বলে, কে যাইবা জঙ্গলে! তাব কথায় একশ যোয়ান সব সময় ওঠবোস করে। সেই গোঁসাই কেমন হয়ে গেল! রা করে না। মাথা গোঁজ করে খেয়ে উঠে যায়। সন্দ ঢুকলে আমি কি করি! নষ্ট হইয়া গেলে ফিরৎ কে আসে কও? তবু গোঁসাই মানে না। বড় একরোখা জীব। মনে যা ঢুকব তার বশে চলে। আর সব রসাতলে যায়।

বাবলি বড় ফাঁপরে পড়ে গেছে। বাড়িতেই ফিরে যাবে কিনা ভাবল। ঘর দোর খোলা রেখে এয়েছে। বাড়িটায় একা থাকতেও ভয়। ফাঁকা মাঠে ঝুপড়ি। সে পুঁইয়ের মাচান করেছে, নারকেল গাছ লাগিয়ে গেছে জ্যাঠা। ছোট্ট একখান পানের বরজ করেছে লাউ কুমড়া যখনকার যা সবই লাগায় বাবলি। পুরুষরা যখন বনে কাঠ কাটতে যায়, অথবা

ঘেরিতে খাল কেটে মাছ নিয়ে আসে তখনও মেয়েদের কত কাজ থাকে। তার কাজের কোন শেষ ছিল না। গাছে গাছে জল দেওয়া, গাছগুলি বড় হয়, বাবলির রক্তের মধ্যে ঝড় ওঠে, মাটির জন্য মায়া বেড়ে যায়। চারপাশের এই বাড়িঘর দেখলেই বোঝা যায় কত প্রিয় সব গাছপালা। এইসব ফেলে গোঁসাই ক্যামপের কোন দিকে গেল? তাও একা একা। যেন এক্ষুনি কেউ তাকে এসে খবর দেবে, গোঁসাই সদর রাস্তায় পড়ে আছে লাশ হইয়া। মনে যে কত আকথা কুকথা আসে। বাবলির পা কেমন অসাড় হয়ে আসছে। সে আর এগুতে সাহস পেল না। মিটিনে ফিরে গিয়ে খবর দিলে হয়। বৃন্দাবন কাকা, কালীপদ তালঐ, সবাইকে বললে হয়, অরে একা ছাইড়া দিলেন ক্যান। অর মাথা ঠিক নাই।

সে কিছুটা সদর রাস্তায় একা একা বসেছিল। সামনে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ির শব্দ। কেউ যদি তুলে নিয়ে যায়, টের পাবে না, সে আবার বসতের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকল। মনটা বড়ই কু-ডাক ডাকছে।

সবাই শুনল তখন, অন্ধকার সদর রাস্তা থেকে কেউ যেন চিৎকার করতে করতে আসছে। —বাবা কাকারা কে কোথায় আছেন, আমারে বাঁচান।

কে এমন আর্ত ডাক ছাড়ে! মণীন্দ্র কালীপদ আরও সব লোকজন যারা জড়ো হয়েছিল, তারা কান খারা করে শুনছে। নাড়ীকণ্ঠ! তার পরই মনে হল, ছুটতে ছুটতে কেউ এদিকে আসছে। দু-বছর ধরে এমন সব কাণ্ড কারখানা দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। লোকগুলির রোমকূপে তখন ঘাম দেখা দেয়। কে যেন বলে, বাঘ আসছে। শাবল কোচ কোদাল এক হলা যার যা সম্বল আছে নিয়া বাইর হও। মশাল নিয়ে ওরা ছুটতে গিয়ে দেখল, বাবলি সামনে। ভুতুরে চোখ মুখ। আর কি বলছে! হাউ হাউ করে বলছে। —বাবা কাকারা, অরে আপনেরা একলা যাইতে দিলেন ক্যান। অয় কোনখানে গ্যাল।

অর ক'দিন থাইকা মাথা খারাপ হইয়া আছে। নিঘঘাত কিছু অর হইছে। আপনেরা অবে খুঁইজা আনেন। পায়ে পড়ি।

কৌশলার বাবা সূর্যমোহন সবার আগে দৌড়ে গেল। কাচা পাকা দাড়ি গালে। চোখ কোটরাগত। বড় ভয়ংকর দেখতে, যেন কামড় দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। মশালেব আলোতে ভয়াবহ চোখমুখ দেখে পৃথিবীর যে কোন সভ্যতার আঁৎকে ওঠার কথা। বাবলির কী গভীর ভযঙ্কব চোখ মুখ। সূর্যমোহনই বলল, কি হইছে কবিত।

—আমার মা নাই, বাপ নাই। ভাই নাই। জ্যাঠা আছিল। তাইনও গেল সালে গেল। আছিল এক গোঁসাই। তাইনও নাই। কুড়াল কান্দে কইবা কই গ্যাল গিয়া।

এতক্ষণে সবার হুঁস হল, বসতের এক নম্বরের যোয়ান মিটিনে আসে নাই। আসলে সবাই এত ক্রুদ্ধ, এত উত্তেজিত যে, কে এল কে এল না মাথায় আসে নি। কেবল সেই একজন, যে বাবলিকে বলেছিল, সেই বলল নিতাই ক্যামপের দিকে গেল।

—ক্যান গ্যাল।

—জানি না কাকা বাপবা। ক্যান গেল জানি না। বাবলি বলতে বলতে ভুঁইয়ে লুটিয়ে পড়ল।

বসতের মানুষগুলি কেমন বোবা হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই নিতাই একদিন সারা বসত হল্লা করে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। কন, আমার বাপেরে কোনখানে রাইখা আইলেন। কন তার, কি পাপ ছিল। আমার ঠাকুর বাপের কি পাপ ছিল। কন আপনেরা। খাইটা খাইলে মানুষের জান যায় কোন সমাজে আছে? সেদিনও কেউ জবাব দিতে পারেনি। আজও মনে হচ্ছে তারা চুপই থাকবে। কারণ এখান থেকেই শোনা যায় লঞ্চের ভট ভট শব্দ। লঞ্চে পারাপার করছে সি আর পি। লোক গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে। একমাত্র কাজ এই অন্ধকারে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া, অন্ধকারে যতটা পারা যায়, খুন জখম করা। দিনের বেলায় হামলা হলে তারা কেউ পেরে উঠবে না।

এরই মধ্যে আছে কেউ কেউ, যেমন থাকে, যেমন সব জায়গাতেই থাকে, যারা বাক্স বন্দী করে লোটা কম্বল নিয়ে ঘাটের দিকে যাচ্ছে। লিস্টি মিলিয়ে ও-পারে নিয়ে যাবে তাদের। সেই দলের কেউ কেউ ভিড়ের মধ্যে যে না আছে কে বলবে।

সূর্যমোহন কালীপদ বৃন্দাবন মনীন্দ্র কোন কথা বলতে পারছে না। খামোখা এগিয়ে দিয়ে এই যোয়ান ছেলেদের সর্বনাশ করে লাভ নেই। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ কাম করা দরকার।

মনীন্দ্র বলল, তুই বাড়ি যা। এই নধর, যাও, অরে দিয়া আয়।

—না আমি যামুনা।

—ডর লাগে? ঠিক আছে, নধর, তর মাসির কাছে রাবলিরে রাইখা আয়।

—না আমি যামু না।

তুই থাইকা কি করবি। ঠিক হইছে মেয়ে কাচচা বাচ্চা সব জলে ভাইসা জঙ্গলে ঢুইকা যাইব। যতক্ষণ জঙ্গলে যাইতে না পারে, আমরা হল্লা কইরা সি আর পি আটকাইয়া রাখুম।

আর তখনই আর এক যোয়ান, সে দৌড়ায়, এই শেষ সময়, গলায় কোপ বসাবার সময়, সে মাতালের মত ক্যাম্পের কাছে গিয়ে হাঁক ছাড়ে।

—সখারাম আছনি?

—কে হাঁক ছাড়ে?

—আমি নিতাই।

বড়বাবু সখারামের কাছে খবর যায়।

সখারাম আলোর মধ্যে দিয়ে ছায়া ছায়া হয়ে হাঁটে। চারপাশে সিপাই। সে দূরে দাঁড়িয়ে দেখে একটা লোক তার নাম করে ডাকছে। বড়বাবু টর্চের আলো ফেলতেই বুঝতে পারল, পতঙ্গ আপনি আপনি উড়ে এসেছে। গুলি করে লাভ নাই। সে হুকুম দিল, মাথা খারাপ লোক আছে। পেছন থেকে ধরে ফেল। তারপর সদরে চালান করে দাও

সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আগে থেকে সাফ সোফের কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখা ভাল। যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল। চারজন সিপাই ক্রমে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে। সুপারি গাছের ছায়ায় বোঝা যায় না। নিতাই হামলা করছিল, আসলে রক্ত মাথায় উঠে এলে মানুষের যা হয়।

দিক বিদিক জ্ঞানশূণ্য মানুষ নিতাই। তাকে কব্জা করা খুবই সহজ। সহজেই চারজন সিপাইর কাছে কব্জা হয়ে গেল। ক্যাম্পে হামলা করার অভিযোগে সে চালান হয়ে গেল।

॥ আট ॥

—মিঞা কই যাও?

—নাবাণগঞ্জে যাই। হাসিম চোখ উল্টেই রাখল। যেন কত হাবাগোবা মানুষ হাসিম। বিড় বিড় করে বকে চলেছে।

—তোমার নাম মিঞা?

—হাসিমালি। সাং নয়াপাড়া। ইসমাতালি সেখ আমার চাচা।

—পথেঘাটে লোক খুন হইতেছে, তোমার বেজায় সাহস মিঞা!

—আমি সেখের বাচ্চা। আমারে খুন করব কোন মাইনসে! বলে চোখ সোজা করে ফেলল হাসিম। তারপর যেন দাঁড়াতে নেই, সোজা হেঁটে যেতে হয়, সে থপ থপ করে লাঠিতে ঠক ঠক শব্দ করে হাঁটতে লাগল। কিন্তু হায় নদীতে কলমিলতার ভিতর এক পাতিল ভাইসা যায়। জলের ভিতর এক মনুষ্য নিশ্চিন্তে ডুইবা আছে। হাসিম গাজীর পীদের বায়ানদারের মত কোমর বাকিয়ে হাঁটে। তারে দেখুক, সে একজন বাউল বিবাগি মানুষ, তারে দেখুক। হাতের লাঠি চান্দের

লাখান মুখখান, সে হাতে লাঠি নিয়ে হ্‌াঁটে তারে দেখুক। নদীতে চোখ ক্যান মিঞা। হাসিমের পরানডারে কে যেন খাবলা দিল একটা। সে আরও জোরে না পেরে গেয়ে উঠল, শূন্যের মাঝারে বানাইলাম ঘর-বাড়ি। আর ঘরবাড়ি হ্‌াঁক দিয়েই সে ঠক ঠক করে পাথরে লাঠি ঠুকল, ভয় ভয়। ভাইস্যা উঠলে পরাণ, ভয় ভয়।

আর তখনই হাসিমকে অনুসরণ করে আসছিল যে লোক দুটো, কেমন মসকরা করে বলল, অ মিঞা দেখছনি, পানিতে পাতিল ভাইসা যায়।

হাসিমের শরীর অসাড় হয়ে আসছে। দুই অমানুষ তাড়া করছে তারে। সন্দ করছে। সে তেমনি হাটছে থপ থপ। যেন পাতিলের কথা শুনতে পায় নি। থামলেই লোকগুলি ওর চোখ দেখে টের পেয়ে যাবে। হাতে সুপারির শলা। চোখ দেখে সন্দ হলে গেঁথেও দিতে পারে। তাই হাসিম সেই আগের মত আউল বাউল মানুষ, ইহ-সংসারের সুখ দুঃখের অতীত মানুষ। সে আবার তাদের গাজীর গীদের গান শোনাল, যেন হাওয়ায় পারলে লাঠি উচিয়ে এক তারার মতো লাফ দিয়ে গেয়ে ওঠে—এক যে ছিল গাজী ভাই, গাজীর পরাণে সুখ নাইরে নাই। সে ঘুরে ঘুরে নাচল। আর লাঠিতে তাল দিল ঠক ঠক। পরাণ ভয় ভয়। চান্দের লাখান মুখখান, গাজীর গীদের বায়ানদার—পরাণ ভয় ভয়। সে নেচে নেচে ওদের বিবাগী করে তুলতে চাইল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! তামাসা দেখার মত ওরা শলা হাতে নিয়ে পাতিলের দিকে নেমে যাচ্ছিল।

হাসিম এবার চিৎকার করে উঠল, অ মিঞা ভাইরা, পাতিল হাওয়ার ভাইস্যা যায়। দ্যাখছেন না উত্তুরে হাওয়া দিতাছে।

—হাওয়া কোনখানে দ্যাখতাছ মিঞা! হাওয়া দ্যাখছি কলমি-লতা মানে না!

হাসিম এবারে আদাব দিল, যেন এবারে যথার্থই গাজীর গীদ শেষ। সে এবারে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। গানের শেষে আদাব

দেবার মত ভঙ্গী করে ডাকল, অ মিঞা ভাই কন দেখি চান্দে প্যান্দে তফাৎ কী! কন দেখি গমে গরমিতে তফাৎ কী! মাটিতে ফসল ফলে কার লাগি! কোন সে মানুষ আছে তিন ভুবনে ফসলে রস দেয়, পরাণের ভিতর রস দেয়—অ মিঞা দৌড়ান ক্যান, আল্লা বুঝি সব হাওয়া আপনেগ তরাসে গিল্যা ফ্যালাইছে!

ওরা হাসিমের কথা শুনল না। ওরা পাতিলের পাশে গিয়ে তামাশা করার মত সুপারির শলা ছুঁড়ে দিল। পাতিলের ভিতর দিয়ে শলাটা পরাণের ব্রহ্মতালুতে ঢুকে পালকের মত খাড়া হয়ে থাকল। পরাণ জল থেকে উঠে দাঁড়াল সহসা। মুখে পিঠে রক্তের ফোয়ারা নেমেছে। জলে ডোবা এক মনুষ্য যেন আকাশ ছুঁতে চায়। দু হাত উপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, কিরণীরে পাইছি। পা……ই……ছি।

ভাঙ্গা পাতিলটা বুকে জড়িয়ে অসার পরাণ জলে ফের হারিয়ে গেল। তারপর কিছু বুদ বুদ দেখা গেল। আর কিছু না।

আর তখন পারে দুই অমানুষের অট্টহাসি। হাত তুলে দেখাল ঐ যে কাফের যায়। বলেই হাসিম যেদিক পালাচ্ছে সেদিকে ছুটতে থাকল। —কাফের যায়। এক ধ্বনি, ঐ যে কাফের যায়, হাত তুলে দেখাচ্ছে আর ছুটছে হাসিমের পেছনে। ওরা মাঠের ভিতর, খাড়া পাড় ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে ফাটল পার হচ্ছে। আর সেই অট্টহাসি—কাফের যায়, কাফের যাইতেছে। ধরেন। যব গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়া এক কাফের যায়। সন্ধ্যা হয় হয়, যব গমের ক্ষেত পার হয়ে এক কাফের ছুটে যায়। পাখিরা ঘরে ফেরে, যবগমের ভিতর এক কাফের লুকিয়ে রয়। ওরা শলা দিয়ে গাছগুলির মাথায় বাড়ি মারছে আর কাফের খুজছে। পেলেই শলা দিয়ে পেটে আর একটা খোঁচা। এক কাফের পানীতে আর এক কাফের যব গম ক্ষেতে। তারপর দু'জন কাফের দু জায়গায় আলিসান এক ভুজঙ্গের মত পড়ে থাকবে।

হাসিম খুব নুয়ে যবগমের খেতে ছুটছে। সামনে বড় বড় ফাটল। সে ফাটলগুলি লাফ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুভয় হাসিমকে অস্থির

করে তুলছিল। সে একবার ভাল করে দাঁড়াতে দেখতে পেল খুব কাছে এসে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রতিপদের চাঁদের ফালিটা দামগড়ের মিলটার চিমনিতে মরা কাকের মত ঝুলে আছে। সামনে আবার একটা বড় ফাটল। পড়ি মরি করে সে লাফ দেবার আগে বলল, খোদা ভরসা। তারপর লম্ফ। লম্ফ যারে কয়। লম্ফ প্রদানে বাঁ-পাটা গ্যাল। অসাড়। সে বুঝল, খোদার ইচ্ছাই এটা। সে আর এক পা এগুতে পারবে না। বাঁ-পাটা মচকে গেছে। ভেঙ্গে গেছে। কঁকিয়ে উঠতেই দেখল গজ দুই ফাটলের ও-পাড়ে দুই অন্ধকারের জীব হা হা করে হাসছে। এখন শুধু খোঁচা মারলেই হাসিম সাবা হয়ে যাবে। সে হাত জোড় করে পড়ে থাকল মাটিতে। সে গোঙাতে থাকল। কোন রকমে বলল, আমি কাফের না। বিশ্বাস করেন, আমি ইমানদার সেখের বাচ্চা। আমার নাম……।

কে শোনে কার কথা। তবু খুঁচিয়ে মারার আগে একবার ওপাড়ে লাফ দিয়ে গিয়ে দেখতে হয়, লুঙ্গি তুলে দেখলেই টের পাবে—কাফের যদি নাই হও, দৌড়াও ক্যান! কাফের না হলে ডরাও ক্যান।

হাসিম ভয়ে কুকুরের মত ফাটলের ও পাড়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে আছে। তবু একজন যেন ভারি দয়াবান বলল, লুঙ্গি তুইলা দ্যাখা যাউক। আরজন বলল, লাফ দিয়া পার হন তবে।

হাসিম কিছু বলছে না। কি যেন দেখছিল। আর মনে মনে কিছু ভাবছিল। ওপারে ফাটলের মুখে লাঠিটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। খুব ঝুঁকে না দেখলে বোঝা যায় না। দু'জনই ছুটে আসছে লাফ দিয়ে ফাটল পার হবে বলে। হাসিম জিভে টক টক করে তালু ঠোকরাল। তারপর লাফের মুখে পায়ে লাঠি আটকে দিল পর পর। একজন হড়কে নিচে না পড়তেই আর একজন পড়ছে। গড়িয়ে সেই ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। বিশবাইশ হাত নিচে পড়ে গেছে। কান পেতে শুনল গোঙানি আসছে। নড়তে পারছে না। কোমর হাঁটু সব ভেঙ্গে পড়ে আছে হোমন্দির পুতেরা।

হাসিমের আর তাড়া নেই। সে ইচ্ছে করলে বসে এখন জামবাটিতে চিড়াগুড় খেয়ে নিতে পারে। সে নিচে ঝুঁকে বলল, কি মিঞারা, আপনেরা আসমান দ্যাখেন, চাঁদ তারা দ্যাখেন আমার খিদা পাইছে চিড়াগুড় খাইয়া লই। পায়ের দিকের ব্যাথাটা আর কেন জানি কাতর করছে না। লাঠিতে ভর দিয়ে হলেও সে ভেগে যেতে পারবে। কিন্তু মনের মধ্যে, এক বড় তোলপাড় করা বান ভেসে যাচ্ছে। —পড়ান ভাই, আল্লার মুখ রাখতে পারলাম না পরাণ ভাই। তারপরই মনে হল, অনেক কাজ বাকি, সে ফের ঝুঁকে বলল, দোজখের পথটা চোখে পড়তাছেনি! তারপরই জোরে হা হা করে হেসে উঠল। পরাণ ভাইরে আর ভয় নাই। নদীতে সাঁতার দিয়া দ্যাখ, পানিতে ঝিনুক আছে, সব ঝিনুকে মুক্তা হয় নাবে পরাণ ভাই। বলে কেমন বিলাপ করতে থাকল। বিলাপের প্রকোপে কমে এলে হাসিম খাদের ভিতর মুখটা ঢুকিয়ে বলল, কিগ মিঞা ভাইরা, আল্লা সব হাওয়া গিলা ফ্যালাইছে! আল্লা কি কয়!

ফাটল থেকে কেবল গোঙানি ভেসে আসছে। ফাটলের ওপরে বালি মাটি। ফুরফুরে হাওয়ায় বালি নিচে গড়িয়ে পড়ছে। পা দিয়ে হাসিম কিছুটা বালিমাটি ফেলে দিল। দূরে দূরে লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে। কাফের মার শুনে কেউ কেউ এর তয়ে আসতেই পারে। হাসিম এবার চিড়াগুড় খেয়ে জামবাটি দিয়ে বালিমাটি টানছে। বালিমাটির ধ্বস নামাচ্ছে নিচে। পা মচকে গেছে, উঠতে পারছে না।

মাঝে মাঝে কান পেতে শুনছে, গোঙানি উঠছে কিনা। না, সব গোঙানি থেমে গেছে। পাগলের মত সে এবার লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়াবে ভাবল। তখন দেখল লণ্ঠন হাতে কারা এগিয়ে আসছে। সামনে এসে বলল, কাফের কোন দিকে যায় মিঞা।

হাসিম বলল, দিলাম গোড় দিয়া। দুই কাফের যাইতেছিল, দিলাম গোড় দিয়া।

আর অন্ধকারে হাসিমের মাটি ফেলার যেন শেষ হচ্ছে না।

মাটি ফেলা শেষ করলেই গোঙানি উঠে আসে। তারপর আবার জামবাটি আবার বালিমাটি, আবার মুখ ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা, ক্যামন আছেন? আল্লা হাওয়া গিলা ফ্যালাইলে ক্যামন লাগে।

আবাব ছু'জন লোক লণ্ঠন হাতে সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, অ মিঞা পাগলেব মত মাটি ফ্যালতাছ ক্যান।

হাসিম জবাব দিল না। সে পাগলেব মত মাটি কেবল নিচে ফেলেই যাচ্ছে।

ওবা ফেব বলল, মাটিব নিচে কি খোঁজতাছ?

হাসিম তখন হায় হায় কবে বিলাপ কবে উঠল, মাটিব নিচে সোনা খোঁজতাছি মিঞা। আমাব সোনা হাবাইযা গ্যাছে।

ওবা হাসিমকে যেন চিনতে পাবল, তুমি হাসিম মিঞা না?

কত দীর্ঘকাল পর মনে হচ্ছে সে যথার্থই হাসিম, সে সব ভুলে গিয়েছিল। ঘবে ওব বিবি জাবদা আছে ভুলে গিয়েছিল। সে জাম বাটিটা বুকেব কাছে নিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল, উঠতে পারছে না। পা জখম। সে ফের বসে পড়ল।—আপনেরা?

স্থুরিনডারে কিরনীবে তুইলা দিয়া আইলাম।

কোনখানে?

গয়না নৌকায়।

আমারে ইবারে তুইলা লন। ঠ্যাং ভাইঙ্গা পইড়া আছি। স্থুরিনডা কিরণী বৌঠান হেপারে যাইব। আল্লা অগ স্থুখে রাইখ।

বিজ বিজে ঘা যেন নিতাইর মাথায়। স্মৃতি, কত কথা, পারুলকোট, কলমি পাহাড়, বাপ স্থুরিনডা, ঠাকুরবাবা পরাণ, সবাই মাথার মধ্যে বিজ বিজে ঘা বানিয়ে ফেলেছে। পানের বরজ, পুঁই মাচান, বাবলি, অরণ্যের কাঠ, সব এখন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে মগজে। চোখ ঘোলা ঘোলা। উবু হয়ে বসে আছে। দু-পাশে পুলিশ পাহারা। কোমরে

দড়ি। সদর থানায় সে চালান যাচ্ছে। সেখান থেকে সে কোথায় যাবে জানে না। সেই যে মাথা গোঁজ করে বসেছিল, আর তুলছে না। দু হাটুর ফাঁকে মাথা। বাসের শব্দ। ড্রাইভারসাব হর্ণ বাজাচ্ছে। বাসের যাত্রীরা তাকে দেখছে, দুটো একটা প্রশ্নও করেছে, পুলিশবাবাদের। সে সবই শুনছে। মুখ তুলছে না।

কে যেন বলল, ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।

পুলিশ বাবা বলছে, বড় হারমাদ ছোড়া।

—কি করেছে ?

—কি করেনি। পুলিশের ক্যাম্প উড়িয়ে দিতে গেছিল। পাশে সেই কুড়োলটা, চিক চিক করছে ধার।

বাসের সব ধার্মিক মানুষেরা বড় ভয়ার্ত চোখে দেখছে নিতাইকে। কাল কষ্টিপাথরের খোদাই মজবুত পাথুরে শরীর। মাথায় এক রাশ ঘন কোঁকড়া চুল। লম্বা সাই জোয়ান দস্যুর মতন। নিতাইর পরণে খাকি হাফ প্যান্ট। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। অজস্র ঘামের বিন্দু শরীরে। বড়ই অরাজকতা চলছে। খুন জখম রাহাজানি তালে এরাই করে বেড়ায়। দেখতে ত কত্ত ভলো মানুষের বাচ্চা। ত্যাখো কেমন চুপচাপ বসে আছে। কোমরে দড়ি আছে বলে, সুবোধ বালক হয়ে গেছে। পুলিশকে পর্যন্ত ভয় পায় না। ক্যাম্প উড়িয়ে দিতে চায়। কেউ কেউ সরে দাঁড়াল। যেন ছুঁলেই জাত যাবে।

এ নিতাই ঝিমুচ্ছিস কেন ? পুলিশবাবা খোঁচা মারল একটা।

নিতাই মাথা তুলে দেখল। পুলিশ বাবার সেই নির্বিকার মুখ।

—সামনে নামবি। ওঠ।

নিতাই উঠে দাঁড়াল। বলল, বাবু জল খামু।

—খাবি খাবি।

সেই কোন সকালে তাকে বাসে তুলে দেওয়া হয়েছে। বড়বাবু কাগজপত্র ঠিক করে দিয়ে গেছে। ওতেই নাকি নিতাইর দুষ্কর্মের কথা লেখা আছে। সেটা কি, সে জানে না। তবে হ্যাঁ জিজ্ঞেস করলে বলবে,

তার হাতে কুড়ুল ছিল, সে চেয়েছিল, বড়বাবুর গলা এক কোপে কাটতে। পারেনি বলে তার লজ্জা হচ্ছে। বাবলি তুই নষ্ট মাইয়া। তর কথা আমি আর মনে আনতে চাই না। নিতাই বাস থেকে নেমে থু থু ফেলতেই অবাক, বাবলি রাস্তায় শনে পিসির সঙ্গে পোটলা পুটলি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নিতাই বাবলিকে দেখতে পেয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। বাবলি দৌড়ে আসছে। বলছে, ভয় নাই গোঁসাই। তুমি কইয় না কুড়াল দিয়া ক্যাম্প উড়াইয়া দিতে চাইছ।

নিতাই রাগে ক্ষেপে গিয়ে বলল, তুই এইহানে ক্যান আইলি! তরে কে নিয়া আইছে!

বাবলি বলতে পারত, শনেপিসি নিয়া আইছে। কিন্তু কিছু বলল না। বললেই গোঁসাই ক্ষেপে যাবে

—আ গোঁসাই!

পুলিশ দুজন বাবলিকে আগেও দেখেছে। ওরা বাবলিকে চেনে। বাবলিরও মুখ চেনা। বাবলি বলল, ও বাবু একটু অরে নিয়া দাঁড়াও। মুড়ি আর পাটালি গুড় আনছি। অরে দুইটা খাইতে দাও। কাইল বিকাল থাইক্যা কিছু পেটে পড়ে নাই।

পুলিশের একজন বলল, যা হঠ যা।

—ও বাবু দাড়াও না। খাইতে দাও। মানুষরে না খাইয়া রাখতে নাই। ভগবান গোসা করব।

—বাবলি। নিতাই হুংকার দিয়ে উঠল।

—শান গোঁসাই, আমার ওপর রাগ কইর না। শনেপিসির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি যে ক্যান পিসি আমারে ডাইকা নিয়া গ্যালা। তোমরা জান গোঁসাই মাথা গরম লোক আছে। অঃ গোঁসাই। অঃ পুলিশ-বাবু! খাড়ও না!

কিন্তু কেউ দাঁড়াচ্ছে না। বাবলির কথা কেউ শুনছে না। বড়বাবু বলেছেন, তিনি সদর ঘুরে আসবেন। বড়বাবু বলেছেন, তিনি আইনের

লোক, বেআইনি করেন কি করে! তা চালান টালান লেখা হয়ে যাক, পরে দেখা যাবে।

নিতাইর সঙ্গে দেখাও করা যায় নি। নিতাইকে তার আগেই নদীর পাড়ে নিয়ে গেছে। শনে পিসি বলেছে, আর ডর নাই। বড় বাবুরে ধরলে সব হইয়া যাইব। আর বড়বাবুর সদরে কাজ পড়ে গেল, সাত সকালে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। গোঁসাইরে একবার শুধু চোখের দেখা দেখতে চায় বাবলি। সঙ্গে পাটালিগুড় এনেছে। মুড়ি এনেছে। টিউকল থেকে জল পাম্প করে আনবে। —অ গোঁ[illegible] পুলিশবাবু, খাড়ও না। গোঁসাই পায়ে পড়ি, তুমি কান গোঁ[illegible]পা উড়াইতে গ্যাছিলা। কে তোমারে মাথার দিব্ব দিছে। সংগে যাইব গিয়া। আইনের লোক তেনারা, বেআইনি কাজ করেন কি কইরা। তোমার মত বাবুরা ত আর পেট মাটিতে দিয়া শুইয়া থাকে না। ঘুঁষে আইন থাকব না। অ গোঁসাই, একবার তাকাও না আমার দিকে তুমি যেখানেই যাও আমি তোমারে ছাইড়া যামু না।

নিতাইর চোখ ছল ছল করছে। সে বাবলির দিকে চোখ তুলে তাকাল। বাবলি বোঝে গোঁসাই তার বড় সরল মানুষ। কাইল যদি বের হয়ে না যেত, তবে মাথা গরম হত না গোঁসাইর। তারপরই মনে হয়েছে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। কবে যেন বাপ পিতামহ এই এক গল্প, সেই রাজা যায়, বনে যায়, শিকারে যায়, সঙ্গে মন্ত্রিপুত্র, কোটাল পুত্র, শিকারে গিয়ে রাজা পথ হারায়, তারপর পাতকুঁয়া জল এবং মন্ত্রিপুত্রের কথা, যা করেন ভগবান মঙ্গলের জন্য করেন, বড়বাবু সত্যি দেবতা। আর যাই হোক, বাড়ি পোড়াবার সময় ঠিক হামলা হবে। তখন নিতাইর জীবন সংশয় হত। থানায় চালান দিয়ে বড়বাবু মন্দের ভালো করেছে। গণ্ডগোলের সময় মাথা গরম লোকের আগে মাথা ফাটে। বাবলির এই একটা সান্ত্বনা কাজ করছে। বাবলি গোঁসাইর চোখ দেখেই টের পেয়েছে, রাগ পড়ে এসছে গোঁসাইর। সে কাছে গিয়ে বলল, দিমু, খাইবা।

—জল দে।

সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়াল। বাস রাস্তার পাশ দিয়ে আমবাগানে একটা টিউবকল আছে। জামবাটি করে সে জল নিয়ে এসে দেখল, পুলিশ বাবারা নিতাইকে থানায় তখন ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাকে ভিতরে যেতে দিল না। সে রাস্তার জল নিয়ে গাছের নিচে বসে থাকল। গোঁসাইর তেষ্টায় ছাতি ফাটছে ভাবতেই বাবলির চোখে জলে ভার হয়ে এল। পৃথিবীতে তার এক গোঁসাই মনুষ্য বল, ভগবান বল আছে। তারেও আজ কারা যেন তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। অবলা রমণী সে। বড় বিহ্বল হয়ে পড়ছে ঠিক বেঠিক বুঝতে পারছে না।

॥ নয় ॥

নিতাই দেখল তাকে একটা ছোট্ট ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাত কোমরে কোন দড়ি দড়া নেই। লোহার রডের বড় পেল্লাই দরজা। পাশে লম্বা বারান্দা চলে গেছে। সেপাইর বুটের শব্দ কানে বড় খট খট শব্দ তুলছিল। লম্বা দেয়াল। অনেক উচুঁ। আরও দু'জন মানুষ মেঝেতে শুয়ে আছে। তেষ্টায় নিতাইর ছাতি ফাটছে। সে দরজার গরাদে মুখ রেখে বলল, সিপাইজী।

সিপাইজীর বড় গম্ভীর মুখ। গোঁফ লম্বা। মাথায় টুপি। হাতে লাঠি। তার যেন কিছু শোনার সময় নেই। নিতাই ফের বলল, সিপাইজী।

হারমাদ লোকটাকে রুল দিয়ে গুতো মারা দরকার। কেবল সিপাইজী সিপাইজী করছে। শালা হারামী এখন কত সুবোধ বালক। যা একখান কুড়াল থানায় জমা পড়েছে দেখলেই পিলে চমকে যায়। সে তার হাই তোলার মত অথবা হাঁচি কাসির মত নিতাইকে গরাদের ফাঁকে পেটে

একটা কলের গুঁতা মেরে বসল। যেন কিছুই নয়। কাঁঠাল টিপে টুপে দেখার মত। কলের গুঁতা খেয়ে নিতাইর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তখনই পাশের সেই উঁচু হয়ে বসে থাকা লোকটা তাকাল। বলল, আরে নিতাই। সে দেখল, অভয় খুড়ো।

নিতাই যেন হাতে আসমান পেল। বলল, অভয় খুড়ো! তুমি এখানে! খুড়োর চোখ মুখ কেমন নিস্প্রভ।

—আছি। তেনারা দয়া করছেন।

—কবে থাইকা।

—মনে নাই।

তালে সখারাম অভয় খুড়োকেও এখানে চালান করে দিছে। তারা অজ্ঞ মানুষ। আইন আদালত বোঝে না। পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা জেনেই বসে আছে। অনেক দূর গড়াবে। এমন কি দু চার বছর জেল জরিমানা, অনাদায়ে আরও বছর খানেক ঘানি টানা। অভয়খুড়ো বলল, তোরা জানস না!

—না খুড়া।

—খবর পাঠাইছিলাম।

—কেউ খবর দেয়নাই।

অভয় জানে ছুতো নাতায় ধরে আনা হচ্ছে। সে বলল, আর কিছু খবর আছে?

—কাইল থাইকা নুটিশ পড়ব।

—জানতাম।

নিতাই দেখল, খুড়োর চোখ জ্বলে না। পিঠে, হাতে পায়ে কালসিটে দাগ। চোখ কেমন রক্তশূন্য। খুড়ো বলল, নিতাই নাম লেহালেই ভাল ছিলরে। দেখ আমারে পিটাইয়া কি করছে!

বাবলি তখনও বসেছিল গাছতলায়। নিতাইরে জল খাওয়াবে। বেলা পড়ে আসে। শনে পিসি বলছে, বড়বাবু যখন আছেন ওর ভয়

নাই। তাইন ঠিক বিহিত করব। বাড়ি যাই ল।

বাবলি মাথা কুটছে। —দেখা না কইরা যামু না। কাইল থাইকা পেটে কিছু পড়ে নাই।

শুনে পিসি বলল, আমারে দে। দিয়া আসি।

—তুমি যাইতে পার, আমারে যাইতে দিব না ক্যান পিসি।

—আইন আছে না ল! আইনে কি সবার পাশপোর্ট মিলে। আমারে চিনে, বড়বাবুর ঘরের মানুষ আমি। আইন হইল গে আর এক ভগবান। তারে-অ পূজা দিতে হয়। এইটাই তরে শিখাইতে পারলাম না। কইলাম কত কইরা বড়বাবুর মর্জি মত চল। তা না চললে আইন থাকে কি কইরা ক।

বাবলিকে রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে থাকতে দেখে কিছু লোকজন জড় হচ্ছিল —কি হয়েছে মেয়ে? বসে আছ কেন? মাথা কুটছ কেন? শুনে পিসি পাশে বসে বলছে, আপনেরা যান বাবু ভাইরা। ঘরের মাইয়া রাগ কইরা বইসা আছে

বাবলি বলল, না বাবারা আমি রাগ করি নাই। গোঁসাই আমার উপর রাগ কইরা কাইল চইলা গেছিল। অ মা তারপর শুনি পুলিশ বাবারা তারে চালান দিছে। মুড়ি পাটালী গুড় নিয়া আইছি। জল খাইতে চাইছিল। পুলিশ বাবারা দেয় না। আমি খাই কি কইরা কন। কাইল থাইকা আমার গোঁসাই না খাইয়া আছে।

শুনে পিসি সহসা ক্ষেপে গেল। তারপর লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বলল, আপনারা যান বাবু ভাইরা। ঘরের মাইয়ারে ঠিক বুঝাইয়া নিয়া যামু। লোকজন চলে গেলেই বলল, তুই কি গরমেণ্টের চাইয়া ভাল বোজস। অরা বোঝে না কার কি কখন দরকার। যারে পুলিশে দিতে হয়, তারে পুলিশে দেয়। যারে জমি দেওয়ার, তারে জমি দেয়। সব দিকে নজর। গরমেণ্ট হইল ভগবান আদালত। তার পাঁচরকমের কাজ। তাইন যা করে ঠিক করেন। বড়বাবু আমাগ গরমেণ্ট। তুই তারে ক্ষেপাইস না। ল, বাড়ি যাই। রাইতে তাইন ক্যামপে যাওয়নের সময়

দেখা কইরা যাইব। তখন পায়ে লুটাইয়া পড়। সব উদ্ধার কইরা দিব। তার ক্ষেমতা কত জানলে নিতাই ক্ষ্যাপামি করতে সাহস পায়!

—তোমার বাড়ি গরমেণ্ট যাইবে।

—যাইব না। রোজই যায়। তাইন না থাকলে ক' আমার কপালে দুঃখ ছিল না! তাইন আছে বইলা আমার জ্যোউত্যা এ-পার হে-পার করে। মাল নিয়া যায়। মাল নিয়া আসে। কেউ পারে তার চুলের ডগা ছুঁইতে। গবমেণ্ট ঘরে থাকলে রাজা হইতে কতক্ষণ! বাবলি বুঝতে পারল পিসি তার তৃতীয় পুত্রের কথা বলছে। বাবলি বলল, ঠিক কও গরমেণ্ট তোমার ঘরে যাইব।

—ঠিক কই না মিছা কথা কই?

বাবলি বড় নিরুপায়। এই বিশ্বসংসারে তার যে সম্বল ছিল তাকেও চালান করে দেওয়া হয়েছে। সে মাথা কুটেও দেখল, কেউ ফিরে তাকায় না। পুলিশ বাবাদের সবাই ডরায় এখন সে মনে করল, শনে পিসিই তার সম্বল। চোখ মুছে একবার শুধু যে-পথ ধরে নিতাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিকটা দেখল। কোথায় নিয়ে যে এমন সাই যোয়ান মানুষকে তারা হাপিজ করে দিল। তার চোখ জ্বলছে। যেন সে দেখতে পায় দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। সে-আগুনে ঘরবাড়ি পুড়ছে। গরমেণ্ট পুড়ছে। সখারাম পুড়ছে।

জ্বালায় বুক বাবলির খাঁ খাঁ করছে। সে আর পারছে না। কেবল কোন অলক্ষ্যে তার ভাগ্য দেবতা দাঁড়িয়ে আছে, বাবলি তাকে যেন খুঁজল। তারপর বলল, ভগবান আমার গোঁসাইরে যারা জল খাইতে দেয় না তাগ ক্ষমা কইর না।

শনে পিসি তাড়া লাগাচ্ছে। বাসে কিছুটা পথ। তারপর হেঁটে। গরমেণ্টের জিপ যায় একখানা এমন পথ আছে। পথটা গা গেরামের দিকে চলে গেছে। তারপর কুমারমঙ্গল। মনুষ্যের বাস কম। মনুষ্য চায় জমি জিরাত নিয়ে বাঁচতে। গরমেণ্ট কাঁটা হয়ে আছে।

সে তার মুড়ি পাটালিগুড় তেমনি যত্নে বুকে চেপে রেখেছে। বাড়ি

ঘরে আর কিছু নাই। ছিল একখান জামবাটি, তাও সঙ্গে এনেছে। গোঁসাই যেখানে নাই, সেখানে সে থাকে কি কইরা। তার বুকে হাহাকার বাজছে। সারাটা রাস্তায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। শনে পিসি কত রকমের বোঝ প্রবোধ দিচ্ছে। ডর নাই। গরমেণ্টের লোক হইলে ডর থাকে না। সব জায়গাই তার জায়গা। তারে কেউ কিছু করতে পারে না। তুই বড় বাবুরে ধইরা গরমেণ্ট হইয়া যা। দেখবি তরে কেউ উৎখাত করতে যাইব না। এত সব কথার পরই সে শনে পিসির বাড়িটা দেখতে পেল। সে জানেই না, শনে পিসির এত বাড় বাড়ন্ত। গরু আছে দুধালো। আম জাম কাঁঠালের গাছ আছে। দক্ষিণ দুয়ারী ঘর। বাড়িতে আলাদা বসার ঘর একখানা। শনে পিসি গরমেণ্টের লোক বলেই এত। গোঁসাই কিছুই বুঝল না।

আশ্চর্য বাড়িটাতে শনে পিসি একা! তার ঘরে কত খাবার। শনে পিসি দুধ গরম করে দিল। টিউকলে চান করতে বলল। শনে পিসি ঠিকা ঝির কাজ করত ক্যাম্পে, তারপর কি কৌশলে যে গরমেণ্টের লোক হেয়ে গল!

দাওয়ায় বসে থাকল বাবলি। আর মাঝে মাঝেই বলছে, কই পিসি তোমার গরমেণ্ট কই?

—আল আইব।

—কখন আইব।

—অরা কি তর আমার মত। কত কাজ। কাজে আটকা পইড়া গ্যাছে। আইজ না আসে কাইল আইব।

বাবলি বুঝল ইচ্ছা করলেই সে আর এখান থেকে যেতে পারবে না। চার পাশে কোন মানুষ জনের আবাস নাই। সন্ধ্যায় সাইকেলে এসে একটা লোক এক ব্যাগ কি রেখে গেল। তারপর শনে পিসি টিউকলে চান করতে গেল। রাত অনেক। জোনাকি জ্বলছে ঝোপে জঙ্গলে। আর অনেক দূরে শোনা যায় লঞ্চের ভট ভট শব্দ। কাক পক্ষীও যেন অঞ্চলটাকে ভয় পায়। সে একটা টুলে বসে বলছিল, গরমেণ্ট কোথায়

কি করতাছে পিসি। এহনেও আইল না!

পিসি সন্ধ্যা আহ্নিক করছিল। আবার একটা সাইকেলে অন্ধকারে ষণ্ডা মত একটা লোক এল। শনে পিসির সঙ্গে ইশারায় কা যেন কথা বলল।

শনে পিসি বলল, সান কইরা লযা। গায়ে একখান ত্যানকানি। গরমেন্টের নাকে গন্ধ লাগব না। বলে সে একখান সুন্দর ছাপা শাড়ি এনে দিল। তুই নে। গরমেন্ট পাঠাইছে। তাঁর দয়ার অন্ত নাই।

এমন সুন্দর সায়া ব্লাউজ শাড়ি বাবলি জীবনেও চোখে দেখেনি। হ্যারিকেনের আলোতে তার চোখ জ্বল জ্বল করছিল। গোঁসাই বলত, হউক সব। তরে নিয়া যামু শহরে। টাঙ্গাইলের শাড়ি কিনা দিমু। পারিত ঢাকাই বেনারসী। আগে গাছপালা লাগাই। চোং জমি করি। মাছ শিকার কইবা জলা জায়গায় মানুষের গারমা তুল ধার তহনই সব পাবি। তুই হাত এক কইবা শাখা সিঁদুর দিয়া তবে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী বানাইমু। গোঁসাই তুমি খাইছান।

সে ডাকল, শনে পিসি।

শনে পিসি আহ্নিক করছিল। ভাবল, মাইয়াটা বড় জ্বালায়। তর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। না হইলে গরমেন্ট পাগলা হইয়া যায়। এখনও সানটান করতাছে না। ঠায় বইসা আছে। আর পিসি পিসি করতাছে। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করলে, তার গরমেন্টের খোরাকী নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে প্রসন্ন গলায় বলল, কিছু কইবি?

গরমেন্ট গোঁসাইরে পেট ভইরা খাইতে দিবত?

—দিব না? না দিলে গবমেন্টের রক্ষা আছে? আব এক গরমেন্ট চইলা আসব।

—অরে মারব না ত? পিটায় যদি? এটা বলতে বাবলির বুক ফাটছিল, তবু অনেকক্ষণ ধরে একই চিন্তায় থাকলে যা হয়, মনে আশংকা থাকলে যা হয়, বাবলি না বলে পারল না।

আহ্নিক শেষ। আসন খানা কুলুঙ্গীতে তুলে রাখল শনে পিসি।

উঠোনে বের হয়ে বলল, তুই বড় এক বোধা আছস। কখন থাইকা কইতাছি, সান কর। নতুন শাড় ছায়া দিছে পর। খাইয়া দাইয়া ঘুম যা। গরমেণ্টের চিন্তা তরে করতে কেডা কইছে!

তাইত! বাবলি ভাবল, গোঁসাইর সব চিন্তা গরমেণ্টের। সে এবার মনের খুশিতে চান করল। সে তার ভগবানের কাছে বার বার প্রার্থনা করল, হে ভগবান, গরমেণ্টরে পাঠাইয়া দ্যাও। তার পায়ে লুটাইয়া পড়। তাইন পারেন সব করতে। তাইন শনে পিসিরে কত দিছেন, তেনা আমার গোঁসাইরে আইনা দিব বেশি কী।

সেই রাত গেল, গরমেণ্ট এল না। বাবলি বিনিদ্র রজনী কাটাল।

পরদিন গেল, গরমেণ্ট এল না। শেষ বেলায় জোরজার করে শনে পিসি খাওয়াল। শরীর নষ্ট হলে গরমেণ্ট রাগ করতে পারে। আর সেই রাতে গরমেণ্ট এল। সাইকেলের ঘন্টি পড়তেই সে দৌড়ে গেল। দেখল, বেশ প্রশন্ন চিত্তে গরমেণ্ট তার দিকে তাকাচ্ছে।

বাবলি পাগলের মত ছুটে গিয়ে বলল, আপনে আমার ভগমান। গোঁসাইরে আইনা দেন।

সখারাম বলল, হবে হবে। অত উতালা কেন! আমি যখন আছি, ঠিক হয়ে যাবে। বলে সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল। শনে পিসি হন্তদন্ত হয়ে হাজির। শনে পিসি ঘন্টি শুনলেই টের পায়, কে সুমার এই মনুষ্যবর্জিত জায়গায় এল। তার রক্তে বড় গুপ্ত সংকেত থাকে। শনে পিসি সহসা বাবলির দিকে তাকিয়ে বলল, রাস্তায় খাড়ইয়া আছস ক্যান। ভিতরে যা। পাখা দিয়া হাওয়া কর। কতটা পথ আইছে সাইকেল মাইরা। যা যা। খাড়ইয়া থাকস না সংয়ের মত। কামে হাত লাগা।

বাবলির বড় ডর লাগছিল। তার বড় চেনা এই গরমেণ্টকে। তাকে একবার ঠেসে ধরেছিল। মুখে ভাল ভাল কথা তুই একা কেন! তোকে কে দেখবে। আমার কাছে চলে আয়। খাবি থাকবি কাজ করবি। আমার অভাব নেই। সেই আমিও তো রিফুজি হয়ে এদেশে আসি।

তারপর কত ঝড় ঝঞ্ঝা। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। এখন দশটা লোক নাম জানে। দশটা লোক ভয় পায়। আর কত কথা।

রিফুজি শুনেই বাবলি বাবুকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে চেয়েছিল। সেই মানুষটার পেটে এত বদ মতলব আছে টের পায় কে কবে। এখন শনে পিসি বলছে, আসল গবমেন্ট হল গে তেনারা। তার কোপে পড়তে নাই।

সখারাম তক্তপোষে বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছে। এই সব সখারামের পয়সায়, ঠিক তা নয়, যাদের সে নিজের করে নিয়েছে, এবং এ-পার সে-পার করতে সাহায্য করে থাকে, সখারামের জন্য তারাই এই সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে। বড় পাকা বন্দোবস্ত। এক বুড়ির বাস্তু ঘর। গাই বাছুর, সন্ধ্যা আহ্নিক এবং সব রকমের গেরস্থ মানুষ যা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সব ঠিক ঠাক করে রাখলে সখারাম কিছু সময় এখানে কাটিয়ে যায়। এটা তার বায়ু পরিবর্তন।

সব কিছু স্বাভাবিক আছে এখন ভেবে সখারামই ডাকল, শনে।

শনে পিসি গুড় গুড় হাজির

—মনা এসেছিল!

—হ্যাঁ দেখা গেছে সব।

বাবলি হাওয়া করছে পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে। সখারাম এ-ঘরে বাবলি আছে যেন জানেইনা মত করে বলল, আজ নোটিশ জারি হয়ে গেল। পনের দিন সময় দেওয়া হয়েছে। গবমেন্ট আর কত সহ্য করবে। না উঠলে ঘর বাড়ি জ্বলবে। আইন বলতে কথা। আইনের কোপ বলতে কথা! তোমরা রিফুজি বলে আইন নিজের হাতে নেবে সে হয়! দেশে কি গবমেন্ট নেই। গবমেন্ট কি হাওড়া গাড়ি। খুশীমত সোওয়ার হয়ে যাবে।

শনে পিসি বলল, মরণ কারে কয়! মরণে ধরছে বাবু। বাবলির দিকে তাকিয়ে বলল, বাইচা গেল। তর ডর নাই। গরমেন্টের লোকের আবার ডর কি। খাতায় নাম না লিখাই লে—অ এই ছ্যাখ তর ও ছ্যাশ। তরে ধরে আর কেডা। কি কন বড়বাবু ঠিক কই নাই!

নিতাইরে নিয়া আইতে কতক্ষণ !

গবমেণ্ট বিষয়টা বাবলির মাথায় আসে না। কারা বানায়, কারা ভাগ ঘর বাইন্দা দেয়, সে তাও জানে না। তবে বয়স বাড়তে বাড়তে সে যা বুঝল, এই হচ্ছে অলিখিত নিয়তি। তার কাছ থেকে বাবলির রেহাই নেই। সে দেখল, গবমেণ্ট এখন উঠে বসছে। শনে পিসি কি ইসারা করল চোখে। গবমেণ্ট বিরক্ত হচ্ছে। —না এখন না। শরীর ভাল না। মন মেজাজ ভাল না। বাবলির দিকে তাকিয়ে বলল, তর গোঁসাই ভাল আছে।

—তারে ছাড়া করে ?

—সময় হইলেই ছাইড়া দিব।

তারপরই শনে পিসির নির্দেশমত বাবলি সখারামের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। —আপনে মা বাপ। আপনে আমার গোঁসাইরে আইনা দ্যান। আমি আপনের বান্দা হইয়া থাকুম।

—আরে ওঠ ওঠ। সখারাম গভীর জলের মাছ। তবু মাঝে মাঝে কি যে হয় ! মাথা ঠিক রাখতে পারে না। খপ খপ করে সবার হাত সব সময় ধরা যায় না, অবলা নারীরও সর্পবিষ থাকে। বিষ দাঁত ভাঙার কৌশল সে জানে। যেমন এখন কিছুতেই নয়, খপ করে ধরা। ধরা যখন পড়বে, তখন খপ করে ধরতে হবে না। আপনি ঝাঁপিতে ঢুকে যাবে। বাবলি বুঝছেনা ঝাঁপিটা সখারাম এখন বানাচ্ছে। সেখানে সে রেখে দেবে বাবলিকে। খুশি মতো বের করে খেলবে।

সখারাম উঠে পড়ল। দরজার কাছে গেল। দারোগাবাবু সেজে আছে। বুট জুতো ঠক ঠক করছে। কোমরে বেল্ট, সঙ্গে মারণাস্ত্র। নানারকমের লাল নীল ব্যাচ বুক পকেটে, কলারে। এই পোশাকে সখারাম বড় তেজী মানুষ। সে বের হবার সময় বলল, মনে ধন্দ রাখবিনা বাবলি। আমি ত মানুষ। থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত ?

বাবলি পরেছে নতুন শিফনের শাড়ি। হাতে গিল্টির গয়না। শনে পিসিই দিয়েছে। সেঁজেগুজে না থাকলে মেয়ে মানুষের কপাল খোলে

না। সকাল থেকেই শনে পিসি এই নিয়ে গাল মন্দ করেছে বাবলিকে। পোড়াকপালী, নিজেও পুড়বি, নিতাইরেও পোড়াবি। গোঁসাইর মঙ্গল কামনায় সে আর নতুন সায়া শাড়ি ব্লাউজ না পরে পারে নি। যদি গরমেণ্ট গোঁসা করে, গায়ে গন্ধ পায়। শনে পিসি এ-জন্য গন্ধ সাবান দিয়েছে একখান। মাথায় শরীরে বলতে গেলে সর্বঅঙ্গ মাজাঘসা করতে বলেছে শনে পিসি। কোথা থেকে কি গন্ধ পাবে গরমেণ্ট, আর তখন গোঁসা করবে, বাবলি পুড়বে। ভয়েই কলতলায় প্রায় খালি শরীর মাঝা-ঘসা করেছিল বাবলি।

সখারাম ফের বলল, কি বললাম?

বাবলির শম্বিত ফিরে আসে! সামনে বেগুনের জমি। পরে ধানের খেত, আল আছে। এ সবই শনে পিসির। তারপরই জঙ্গল। এবং জঙ্গল পার হলে বড় রাস্তা! গোসাবার দিকে গেছে নাকি রাস্তাটা। বাবলি বলল, খাইছি বাবু।

—মন খারাপ করবি না। ভাল করে খাওয়া দাওয়া করবি। ফুর্তিতে থাকবি। চঞ্চল হস না। আইনকানুনে বড় প্যাচ। সময় লাগতে পারে ছাড়িয়ে আনতে। ভেঙ্গে পড়বি না। সদরে খবর পাঠিয়েছি, গোঁসাইর পিঠে কেউ যেন হাত না দেয়।

বাবলি কি বলবে বলবে করছিল। কিন্তু বলতে পারছে না। সখা-রাম সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে বলল, কিছু বলবি?

—আমারে নিয়া যাইবেন?

—কোথায় তোকে নিয়ে যাব?

—গোঁসাইর কাছে। একবার চোখের দেখা দেইখা চইলা আমু।

—তর মাথা খারাপ আছে বাবলি।

—মাথা ঠিক থাকে কন?

সখারাম প্যাডেল থেকে পা নামিয়ে নিল। বেশ রাগ করেই বলল, মাথা ঠিক না থাকে, যা খুশি করগে। খারাপ কিছু হলে আমি কিছু জানি না।

ভগমান, বাবলি কি গোঁসাইর খারাপ কিছু হোক চায়। বাবলি প্রায় ভুল করে ফেলেছে খুব, এমন চোখে তাকাল।

সখারামের বুকটা লাফিয়ে ওঠে। বড় মিষ্টি চোখ মেয়েটার। চোখে বিহ্বলতা দেখা দিলে বাবলিকে এক ঘন ঘোর বর্ষার দিনের মত মনে হয়। মানুষ হয়ে সে ঠিক থাকে কি করে! সখারাম ভাবল একবার বলে, গোঁসাই গোঁসাই করে মাথা খারাপ করছিস, আমি গোঁসাইর চাইতে কম কিসে! তারপরই দারোগা খিস্তি এসে ছিল মুখে, সেটা সামলে বলল, মাথা ঠাণ্ডা রাখলে সব হবে। গরম করলে কিছু হবে না। যা যা ঘুমা। বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়া। কত খরগোস আছে দেখতে পাবি। কত পাখি উড়ে যায় দেখতে পাবি। ফল পাকুড় খেতে ইচ্ছে হয়, শনেকে বলবি। সব এনে দেবে। আমরা গরমেণ্টের লোক, মাথা ঠাণ্ডা মানুষের কাছে আমরা দেবতা। মাথা গরম মানুষের কাছে আমরা অসুর। বলেই সে নিজের হাতটার দিকে তাকাল। এই হাত বাবলি কামড়ে দিয়েছিল। দাগটা এখনও আছে।

সখারাম সাইকেলে চেপে চলে যাচ্ছিল। বাবলি পেছন পেছন ছুটে গেল। ডাকল, বাবু বাবু!

বিরক্ত হয়েই যেন সখারাম সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল।

—বাবু আপনে কিন্তু গোঁসাইরে আমার কথা কইবেন।

—কি বলব?

—বলবেন বাবলি কইছে....... বলেই থেমে গেল। কিছু ভাবল।

—কি কইছে?

—কইছে, মানে কইবেন, বাবলি কইছে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। কইছে গরমেণ্ট মাথা ঠাণ্ডা মানুষের কাছে দেবতা। আমার গোঁসাই ত জানেন বড় মাথা গরম লোক আছে।

অলক্ষ্যে সখারাম হাসল। বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এক অরণ্য তার সামনে। তার চুল মেঘমালার মত দখিনা বাতাসে উড়ছে। স্তন জামবাটির মত পুষ্ট। হাতে পায়ে সবুজ সমারোহ। দিগন্ত ব্যাপ্ত

আকাশের নিচে এই নারী তার সখা সঙ্গীনি ভাবতেই মাথাটা কেমন পাক খেয়ে গেল।

সে কোন রকমে সামলে বলল, বলব। তার কাচা পাকা চুলে বিজ বিজে ঘাম দেখা দিচ্ছে। পারলে সে এই রাতেই মহোৎসবের শুরু করে দিত। কিন্তু যে সয়ে খায় না তার কপালে দুঃখ থাকে। তার এখন বড় দুঃসময়। কী যে হবে, সে জানে না। কারণ কি হবে শেষ পর্যন্ত, কেউ বলতে পারে না। এক অভয়, এক নিতাই শুধু তার উন্নতির কাঁটা হয়ে নেই। মণীন্দ্র, কালীপদ একে একে সব সবল পুরুষই তার পথের কাঁটা। শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাধিয়ে ট্রাকে তুলে দিতে পারলে পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে আগুন দিতে পারলে, সামনেই আরও বড় রাজপথ। সে সেখান দিয়ে ছুটে যাবে। মন্ত্রীরা তার যশগান গাইবে। সারা সরকারী মহলে এক যোগে বলবে, সখারাম একজন বড় জাদরেল অফিসার। তাকে আরও গুরুদায়িত্ব দেওয়া দরকার।

সখারাম সাইকেল মেরে চলে যাচ্ছে। ক্রমে বিন্দুবৎ হয়ে গেল। গোঁসাই জানবে, বাবলি ভাল আছে। গোঁসাই জানবে, বাবলি তার জন্য রাতে ঘুমায় না। গোঁসাই জানবে, বাবলির সে ভগমান।

॥ দশ ॥

গরমেণ্ট একদল লোককে লঞ্চের ঘাটে বসিয়ে রেখেছে। নামের লিস্টি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে এক বড় বাবু। পরিবারের অভিবাবক যারা, তারা ঘিরে আছে বড়বাবুকে। খাতায় সবার নাম বয়স লেখা। তারা সবাই নরহরির দলের মানুষ। সে এখনও পাড়ায় পাড়ায় গরমেণ্টের লোক নিয়ে ঘুরছে। এক দল পাঠিয়ে অন্য আর এক দল—এই করে লঞ্চে পারাপার করে নিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে পাউরুটি গুড় দিয়েছে গরমেণ্টের

দাকেরা। মঞ্চ থেকে নেমে আর এক প্রস্থ ভোজন। সেখানে সারি
ারি ট্রাক। তারপর মাঠের মাঝখান দিয়ে এক সুজল সুফলা অরণ্য
চলে তাদের আবার চলে যাওয়া। যারা যায় ভয়ে যায়। নোটিশ দু-
ন তিন দিন ঝোলে। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় নোটিশ। নানা
কম প্রচারপত্র বিলি করার জন্য আসছে হরেক রকমের লোক। সেই
শে নিয়া যামু, যারে কয় দেশ একখানা, উরাট জমি থাকব না, ইরি-
াশনের জল, সুমার মাঠ, ধান গম রুয়ে দিলেই বাতাসে দোল খাবে।

চোখ মুখ শুকনো, বাদামী বাসি দাড়ি, রুক্ষ চেহারা বউরা মেয়েরা
চামেচি করছে। কাচ্চা বাচ্চাগুলোন, যেখানে সেখানে হাগছে মুতছে।
পুকুর ঘাটে কটু গন্ধ মলমূত্রের। ছাপড়ার নিচে নরহরি চায়ের দোকান
লেছে। এখানে যে বোঝে, সে সব জায়গাতেই বোঝে। ফাঁক রাখতে
য় না। সে এখানেও এই দশ বার দিনে পয়সা কামিয়ে নিতে চায়।

সখারাম সব খবর পায়। নরহরির কি দরকার পারুলকোট
ওয়ার। চতুর মানুষ যখন, বড় দরকার তার মত মানুষ। নরহরি
ষ বেলায় যাবে এই রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাইরে তুলে না গেলে
ধর্ম। নিজের কথা তার মাথায় নেই। সে দৌড়ঝাপ করছে।
কবার পুলিশ ক্যামপে, আবার পল্লীতে। তার লোকেরাও করছে।
ারাম অভয় দিয়েছে, ভয় নেই তোমাদের! শেষ বেলায় ট্রাকে না
ঠ গরুর গাড়িতে উঠবে। কত আত্মীয় স্বজন থাকে মানুষের, তোমা-
রও আছে। তোমরা কোন রকমে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেই
র ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকবে না। তখন খোলা হাওয়ায় বের হয়ে আসতে
রবে

আসলে সখারাম বুঝে পায়না, লোকগুলির মাথায় কি আছে
দের বাবা দলবেঁধে আসার দরকারটা কি ছিল? এখন কি আর
দিন আছে? যার যার তার তার। গরমেণ্ট নিজের জ্বালায় মরছে,
তি তোরা! উপদ্রব করলে সহ্য করবে কেন। আর বলি দেশটাও
াত হয়ে যায় নি। বেড়াতে আসতে পারতিস, ব্যবসার নাম করে

আসতে পারতিস। জনমজুরের কাজ করবি, এই ভেবেও আসতে পার
তিস। কত ইটের ভাটা, কত কুলিকামিনের দরকার, হাজার লক্ষ মানুষ
চলে আসছে না, গরমেণ্ট কিছু বলে ?

সখারাম মাথা চুলকাচ্ছিল। কাচা পাকা চুলে বড় মাথা কামড়ানি
হয়। মুরগীর মাংস রান্না হচ্ছে। সরু চালের ভাত, চাটনি। দই
মিষ্টিও আছে। শনে জল দিতে চা দিতে নদীর ও-পার থেকে আসছে
না। তার এখন আসা বারণ। ক্যামপে বলেছে, নাচারী মানুষ, কখন
কি হয়, সুতরাং এই করে আবও খবর রাখা, বাবলি খাওয়া দাওয়া করছে
কিনা। সময় বড় অবুঝ। যে যত পার হয়ে যায় তত নাড়ির টান কমে
আজকাল মানুষের স্বাধীনতা বড় বেশি। আগের আমল আর নেই
কোথা দিয়ে কি-ভাবে ফেঁসে যাবে সে, কে জানে। বশ করা দরকার
নিতাই অভয় পড়ে আছে, থাক। কানুনের ক্রটি থাকছে। তবে কর্তৃ
পক্ষ চায় ঝামেলা নিবারণ। ঝামেলা নিবারণে এখন আদালতে নিয়ে
গেলেই জামিন। তবে যা রোখা আছে নিতাইটা—তার হাতে কুড়াল
ছিল। নির্ঘাত দুবছরের জেল।

—যতবার প্রশ্ন, হাতে কুড়াল ছিল।

—ছিল।

—কি করতে কুড়াল হাতে নিয়েছিলে।

—সখারামের গলা কোপাতে।

তারপর আর কথা থাকে কি! গোঁয়াড় লোকের বিষয়ে ঝামেল
কম। নিতাই আদালতেও স্বীকার করবে, সে সখারামের নাগাল পাচ্ছিল
না। কিন্তু অভয়টা তুখোর লোক। ফন্দি ফিকির জানে। সে অন্য
রকম বলে খালাস পেতে পারে। জামিন পেতে পারে। এদের ট্রাবে
না তুলে দেওয়া পর্যন্ত সদর বলেছে, আটকে রাখছি, কাজ হাসিল কর
পুলিশের সুনাম অটুট থাক, তারপর না হয় ছেড়ে দেওয়া যাবে, দরকার
হয় আদালতে হাজির করা যাবে।

পুলিশের পাহারা আরও এখন সতর্ক। নদীর পাড়ে পুলিশ

যারা দল বেধে আসছে, তাদের আগে পেছনে পুলিশ। সবই সখারাম সারাদিন ধরে করে যাচ্ছে। শুধু দুপুরের খাওয়া ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা কাজ। দায়দায়িত্ব সব তার। সি আর পির বড় কর্ত্তা বলে গেছে, ধুনদুমার কাণ্ড না বাধলে আমার লোকজন জলে নামবে না। দাঙ্গা হয় গরমেণ্ট চায় না। কাজেই দায়িত্বটা আরও বেশি। তার সম্বল নরহরির সাঙ্গপাঙ্গরা। তারাই গরমেণ্টের প্রচার পত্র নিয়ে বিলি করছে। করতে গিয়ে মারধোর খাচ্ছে। দেশের কাজ করতে গেলেও এমন হয়। সখারাম বলেছে, তোমরা কত বড় সংগ্রাম করছ, জান না! এর কি কোন মূল্য হয়? এতে নরহরির সাঙ্গপাঙ্গরা বেশ যুশ পেয়ে গেছে। এবং নিজেদের মাগ ছেলে দলে রাখছে ঠিক, আবার রাস্তায় সটকে পড়ারও ব্যবস্থা রেখেছে। সখারামই সব করে দেবে। কারণ এখন যা দুঃসময়, এই সব চতুর মানুষ না থাকলে সুজলা সুফলা দেশটাকে পঙ্গপালেরা ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে।

আর ঝামেলাও কত হরেক রকমের। তখন সখারামের মনে হয় কাজের নিকুচি করেছি। দেবী তার চিঠি দেয়, জবাব পর্যন্ত দিতে পারে না। দেবী তার জানে না, সে আরও অনেক দেবীর জন্য পাগল। এক দেবীকে আটকে রেখেছে শনের ঘরে। এক একজন দেবীত নয়, চামুণ্ডা। দেবীর দস্যি ছেলেরা মেয়েরা শহরে উড়ছে। কেউ মাতাল হয়ে ফিরছে। ছোটটা কোথায় বেড়াতে গেছে। শালা সব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। তবু মর্যাদা, বাপ সে, ভাল ইস্কুল কলেজ দেখে সব কটাকে বেশ জিইয়ে রেখেছে। বাপের কত ঠেলা যদি বুঝত। মাথা সাফ না থাকলে সল্টলেকের বাড়ি, দু-খানা ফ্ল্যাট, এবং নামে নামে একাউণ্ট, কাচা পয়সা গয়না, জমি জোত সব কোথায় থাকত! হারামির বাচ্চারা বুঝতিস। ক'দিনে ফুর্তির জন্য কাউকে কাউকে না রাখলে বায়ু পরিবর্তন ঘটে কি করে! এখন শনেই সম্বল। শনে কেবল বলছে, গরমেণ্ট সব করছে। এই করছে বলে আর একটাকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে।

তারপর আছে কীটদষ্ট মানুষের কামড়।—স্যার, কি করি। বুড়া মানুষ। নড়তে পারছে না। দু ক্রোশ পথ আসি কি করে! ইচ্ছে হয়

তখন চিৎকার করে বলতে, পুড়িয়ে দাও শালাদের। ঘরবাড়ির সঙ্গে পুড়ে মরুক। আর জায়গা পেলি না মরতে এলি এইখানে। স্যার রিকেট হয়েছে নড়তে পাবে না। অপুষ্টি জনিত রোগ। শয়ে শয়ে এই সব কংকালসার মানুষের পঙ্গপাল নিয়ে সে যে করেটা কি। তার লোক মারফত এখন খবর, স্যার বড় দায় হয়ে গেছে। রিপোর্ট—এই জাতীয় মানুষের, মানুষ না প্রেত, কোনটা লিখবে স্থির করতে পারে না। ভুঁইয়ে পড়ে আছে। গোড় দিলে ভাল হয়, ট্রেনে তুলে দিলেও রাস্তায় সাবার। টাকা খরচ, ঝামেলা, কোনটা করা দরকার নির্দেশ চাই। নির্দেশ আসে সবাই যাবে। কাণা খোঁড়া পঙ্গু কেউ থাকবে না।

কেউ থাকলেই কথা হবে। খবরের কাগজগুলিত বসে নেই। খবর ফাঁস হয়ে না গেলেই হল। এবং এ-জন্যও সখারামের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি ক্রমাগত পাক খায়। সে রাস্তায় দেখল, ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মানুষজন। ট্রাকের ঝাকুনিতেই সাবার হবে। আধ জীয়ন্ত নিয়ে গেলেও বোঝা যাবে গরমেণ্ট বড় শক্ত গরমেণ্ট।

লঞ্চটা আসছে। খালি লঞ্চ। সারেঙ নামাজ সারছে ডেকে। খালাসিরা, দড়িদড়া টেনে নামাচ্ছে। কাঠের পাটাতন, জোয়ারের জলে নামে ওঠে। ভাটির সময় এক হাঁটু কাদা। দু'একজন এই কাদায় ডুবে গেলেও কম হয় সরকারের বোঝা। পাটাতনে পড়ে থাকে, নড়ে না চড়ে না। সখারাম হাক করে এক গণ্ডুস সিগারেটের ধোঁয়া গিলে দমবন্ধ করে রাখে।

তখন বাবলির উকুন বেছে দিচ্ছিল শনে পিসি। —মাথাটা তর করছস কি! সেও রিপোর্ট পাঠায় সখারামকে, কীটনাশক অষুধের দরকার গরমেণ্ট। কীটনাশক অষুধ এলে শনে পিস নিজেই কলতলায় বাবলিকে নিয়ে বসে। চুলে অষুধ মেখে দেবার সময় বলে, চান্দের শরীর একখান তর। প্যান্দের মত থাকস। ধুইয়া পাইকলে রাখ। সুখ তখন কপালে আপনেই জমবে।

বাবলি বলে, গরমেণ্ট কি কয় পিসি। কতদিন হইয়া গেল।

—গরমেণ্টের মাথা ঠিক নাই। সব পার কইরা দিতে পারলেই ছুটি। তখন নিতাইরে ছাড়াইয়া আনব।

—গরমেণ্ট আর আসে না ক্যান!

—তুই মুখ গোমড়া কইরা রাখলে আসে কি কইরা?

—আমি আবার মুখ গোমড়া করলাম কবে?

—আল মর। বোঝে। তর মনটা কেবল গোঁসাই গোঁসাই করে। গরমেণ্ট সব বোঝে!

—আমি তবে কি করমু কও! গোঁসাই ছাড়া আমার আর কে আছে?

—গোঁসাইরে ধুইয়া তুই জল খাইবি? তর বুদ্ধি যে কি বুঝি না। গরমেণ্ট আর গোসাই এক কথা হইল! মানুষের লয় বুঝসনা ক্যান।

বাবলি কেমন আঁৎকে উঠে। চোখ আর জ্বলে না। টল টল করতে থাকে। বুঝতে পারে সে এক খাঁচায় বন্দী পাখি। সেই যে গান একখানা আছে ফান্দে পড়িয়া বগায় কান্দেল। তার কেমন মনে উচাটন ধরে যায়। শনে টেরও পায় না, মেয়েটার মাথায় যখন জল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, তখন সে প্রাণভরে হাউ হাউ করে কাঁদছে। এবং কান্নাকাটির পরই বাবলির কেন জানি মনে হয় বুকটা হাল্কা। সে খেতে বসে বলে, পিসি সত্য কইরা কও, মাকালীর দিব্যি তোমার মাথায়, আমার গোঁসাইরে আর ফিরা পামু না! আমার পোড়াকপাল আমি জানি, সন্দ গোঁসাইর মনে জানি, তবু তুমি কও, তারে আমি একবার চোখের দ্যাখা দেখতে পামুনা। পায়ে লুটাইয়া পইড়া কমু পিসি, একবার শুধু কমু, বাবলি তোমারে ছাড়া আর কারোরে জানে না। কি পিসি কও, কথা কও।

চুল খাটো করে ছাটা, শনে পিসি সাদা থান পরে কেমন উদাস হয়ে গেল। মাথার ওপরে মানুষের আর কিছু না থাক ভগমান আছে। তার কেন জানি বাবলির মুখ দেখে এমন মনে হল আজ। সে ভাতের গরাস তুলতে পারছিল না। হাত কাঁপছিল তার।

এভাবে কখনও কখনও ঈশ্বর মানুষকে তাড়া করে। গরু মাঠ থে
নিয়ে আসার সময় মনে হল, শনে পিসির সারা আকাশ জুড়ে প্রচ
মেঘমালা ছাড়িয়ে ছিটিয়ে, উধাও হয়ে যাচ্ছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে
হাওয়ায় গাছপালার শাখা প্রশাখা দুলছে। ঝড় হতে পারে। বৃষ্টি হ
পারে। নদীর ক্ষেপণ গর্জন এখানেও বসে তখন শোনা যায়। দূরে
জঙ্গল পার হলেই গহনডাঙ্গা। ডাঙ্গার পথ ধরে খাড়ি নদীতে গি
পড়লে বাঘমাচীর জঙ্গল। সেখানে জ্যোতি থাকে। তার তৃতীয় সন্তান
সে কিছু করলেই জ্যোতির হাতকড়া পড়বে। তবু সেই যে থাকে ন
ঈশ্বর নামক এক ভয়ংকর জীব, যারে যায় না ফেলা, যারে যায় না দেখ
তবু সে থাকে নিরন্তর, গোয়ালে গাই গরু রাখতে গিয়ে শনে পিসি
বার বার মনে হল, কি করে! তারপরই মনে হল, কেউ নেই বাড়িতে
বাবলি কি পালিয়েছে! পালালেও সে যেন রক্ষা পায়। তারপর
মনে হল, সখারাম তাকেও নিস্তার দেবে না। মন দুর্বল করে লাভ নাই
শক্ত হওয়া ছাড়া তার আর কোন পথ নাই। সে মাঠের সামনে সে
জঙ্গলটার দিকে তাকাল। সেখান দিয়ে পালাবার পথ আছে। সে ি
করবে ভেবে পেল না। বাড়ির চারপাশে ডাক খোঁজ করল। পেল না
কি করবে! সে আবার ডাকল, বাবলি তুই আমার বিপদ ডাইব
আনছস ক্যান। বাবলি তুই ক্যান পোড়াকপালী গতর জোয়ারের জ
কইরা রাখলি! তারপরই মনে হল বাবলির ঘরটায় সে ঢুকে দেখেনি
কিন্তু এত ডাকাডাকিতে কেউ যখন সাড়া দেয়নি, তখন আর সেখানে
থাকে কি করে। তবু ঘরের মধ্যে ঢুকেই অবাক। বাবলির কপালে ব
সিঁদুরের ফোটা, পরণে নতুন শাড়ি, পায়ে আলতা মেখে সেজে গুঁ
ঘুমিয়ে আছে। সে দেখল, দেখল। বড় মায়া পড়ে গেল তার। ব
সরল বালিকা বড় নির্বোধ। মেয়েটার জন্য কেন জানি তার চোখ জ
ভার হয়ে এল। অনেক পাপ। অনেক পাপহে ঈশ্বর বলতে বলে
নিষ্ঠুর শনে পিসি মানুষের বড় পাপখণ্ডনে কেমন মরিয়া হয়ে উঠল।

সন্ধ্যায় কাজকামের ফাঁকে সাইকেলে দেখা গেল সেই গরমেন্টে

কব্জাটা আসছে। যাবা শুধু নিজেবাই গেলে। কেবল গিলতে চায়। কেবল সাপটে খেতে চায সব। বাড়িঘব জ্যোৎস্নাময়ী নাবী যুবতী পাপ মেঘমালা উদ্ভিদ সব খেতে চায। সাইকেল থেকে নামলে সে সখাবামকে বলল, বাবলিব শবীবটা ভাল নাই। জ্বব হইছে। শুইযা বইছে।

—মাথা ঠাণ্ডা হযেছে ?

—হইছে।

—আব কটা দিন! সময নাই। বলেই সাইকেল চালিযে দিল। সখাবাম ফেব চলে যাচ্ছে।

শনে পিসি বলল, ভগবান অগ বিচাব কোন গবমেণ্ট কবে ?

আলপথ ভেঙ্গে কিছুটা গেলেই জঙ্গল, তাবপব সদব বাস্তা। শনে সেই দিকে তাকিযে থাকল। সখাবাম কোথাও একা যায় না। সদর বাস্তায তাব কেউ না কেউ আছে। সে তাদেব বেখে এখানে একা আসে। শনে পিসিব মনে হল, মানুষ ধূর্ত না হলে সংসাবে টিকে থাকতে পাবে না। যা-সব এই সখাবামদেব জন্য। গবমেণ্ট পাল্টায কিন্তু সখাবামেবা থেকে যায। সে যতই চেষ্টা করুক বাবলিব নিষ্কৃতি নেই। সখাবামেব হাত ছাড়া হলে অন্য সখাবাম আসবে। সখাবাম জঙ্গলেব মধ্যে যে পথটা আছে তাব মধ্যে ঢুকে গেলে এমন ভাবল। সাময়িক দুর্বলতা এটা তাব। মানুষ বলেই হয। সে সব দুর্বলতা পবিহার কবার জন্য কাজে ফেব মন দিল। গরু দুটোকে নিযে গোয়ালে বাঁধল। খড় কাটল। ভুসি খোলে জাবনা দিল। বাবলি ঘুমাচ্ছে। আসলে বাবলি ভেবে ফেলেছে, সখাবাম নিতাইকে ঠিক ছাড়িয়ে আনবে। এই আশায় বাবলি সখাবামেব কুহকে পড়ে গেছে।

ঘুম থেকে উঠলেই শনে পিসি বলল, গরমেণ্ট আইছিল।

বাবলি চুল খোপা বেঁধে জলচকিতে বসতে যাবে, এমন সময় শনে পিসি কথাটা বলল। খুব ঘুমিযেছে বলে হাই উঠছিল। এই কথায় সঙ্গে সঙ্গে বাবলি টান টান হয়ে যায়। ঘুমের জড়তা শরীরে থাকে না। সে বলল, অমা গরমেণ্ট আইল, তুমি আমারে ডাইকা দিলানা পিসি!

—গরমেণ্ট যে কইল, ঘুমাইছে যখন ডাকতে হইব না।

বাবলি আগের সখারামকে আর মনে করতে পারে না। তাকে জাপটে ধরেছিল, সে কামড়ে দিয়েছিল এইসব আর মনে থাকে না। তার মনে হয়, মানুষের কষ্টে মানুষই পাশে দাঁড়ায়। সখারাম আর তার শত্রুপক্ষ মনে হল না। যেন এখন সখারামের পেছনে সাইকেলে চেপে বাস ধরতেও চলে যেতে পারে। সে শনে পিসির কথায় রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে গেল। বলল, আর কি কইল?

—আর কি কইব?

—আমার গোঁসাইর কথা কইল না কিছু।

—তর যে কথা। মাথায় অর সর্পাঘাত কখন হয় অখন সেই ভয়। তর গোঁসাইর কথা মনে থাকে?

সর্পাঘাতই বটে। এতগুলান মানুষকে ভিটে ছাড়া না করতে পারলে, সখারামের ইজ্জত গবমেণ্টের ঘরে থাকবে না। ইজ্জত মানুষের সব। ইজ্জত মানুষের বড় প্রবল প্রতিপক্ষ। শনে পিসি কিছু কাঠকুটো ঘরে নিয়ে রাখার সময় এমন ভাবল। আকাশে বড় মেঘ করেছে। অঝোরে বৃষ্টি নামতে পারে। ঘরে চাল ডাল আনাজ আছে। কাঠকুটো ভিজে গেলে উনুন ধরে না। সারাদিন এই একটা না একটা তার কাজ থাকে। বাড়তি কাজ বাবলির দেখাশোনা। বাবলি পালালে, সখারাম তাকে বংশে বাতি দিতে রাখবে না। বিকেলের দিকে তার কি যে মতিভ্রম হয়েছিল! সে বলল, কি খাইবি রাইতে?

—তুমি যা খাইবা।

—আমারত কচু কলা সিদ্ধ ভাত। একটা হাঁসের ডিম সিদ্ধ দেই। ডাইল আছে হইব না।

—আমার লাইগা ভাইব না পিসি। এত করছে শনে পিসি, আস্ত একখানা হাঁসের ডিম সিদ্ধ দিব তারে খাইতে—সে যা কখনও ভাবতে পারে না, দুধ দেয় খাইতে, তার জন্য কত করছে পিসি! গোঁসাইটা যে কি! দেখ আইসা গোঁসাই, আমারে নিয়া তোমার ডর আছিল, এখনে

দেখ আইসা, আমার কত সুখ।

এই নির্বোধ বালিকা মাথার উপর মেঘ গর্জাচ্ছে টের পাচ্ছে না। বজ্রপাত হতে পাবে, বুঝতে পারছে না। সে ভাবে ধরণীর বড় বৃষ্টিপাতের দরকার। হ। হ। ভাসাইয়া দে। মাটি ভিজুক। শস্য দানা পুঁইতা দিক মানুষ। সে এব চেয়ে পৃথিবীর স্বভাব চরিত্র বেশি কিছু বোঝে না। এমন কি তার মনে হয়, কে না কে তার নাকে গন্ধ দিয়ে অজ্ঞান করে তুলে নিয়েছিল, মনে হয়েছিল সখারামেরই কাজ, এখন বুঝতে পারছে, বড়ই ভুল করেছে বলে। না জেনে কাবো উপর দোষ চাপাতে নেই। সে সখারামের কাছে সারাটা সময়ই বেইমানি করেছে। সেই সখারামকে গোঁসাই কোপাতে পর্যন্ত গেছিল। কোপাতে চাইলে কার না রাগ হয়। যেমন মাথা খারাপ লোক আছ, বোঝ এখন।

বাবলি পিসির সঙ্গে এখন খড়কুটো ঘরে নিয়ে রাখছে। পিসি বলল, তুই হ্যারিকেনটা গিয়া ধরা। খুব জোরে বৃষ্টি আইব।

সে এখন জানে, এ বাড়িতে কোথায় কি আছে। তিনটে ঘরের কোনটায় কি থাকে সব সে জানে। মাটির ঘর। খড়ের চাল। কুলুঙ্গিতে ম্যাচ বাতি থাকে। জঙ্গলটা পার হয়ে গেলে রাস্তা। একটু আরও এগিয়ে গেলে তিন মাথার মোর। মুদি মনিহারির দোকান। চায়ের দোকান। সকালে মাছ আনাজপাতি সব পাওয়া যায়। আজ তাকে সকালে একা রেখে পিসি বাজার করতে পর্যন্ত গিয়েছিল। দশদিন হয়ে গেল। পিসিই এসে খবর দিয়েছে, সব সাফ কইরা চইলা যাইতাছে। গরমেণ্টের লগে পারে ?

বাবলি বলেছিল, জয়নগরের লোকগুলানের কি হইল।

—অরাই আছে।

অরা অর্থ কালীপদ মনীন্দ্রদের কথা বলছে।

বাবলি বলল, অভয় খুড়া ফিরা আইছে ?

—না।

—কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

—না।

—অখন অগ কই নিয়া যাইব?

—বর্ধমান ইস্টিসনে। হের‌পর রেলগাড়িতে।

—আমারে নিয়া যাইবা। দেইখা আমু দ্যাশের লোকজন কি কয়!

—তয় তরেতো ট্রাকে তুইলা দিব।

সঙ্গে সঙ্গে বাবলি ভয় পেয়ে গেছিল। তার গোঁসাই থাকবে এখানে, সে যাবে অতদূরে—তারপর কোথায়—কোন ঠিকানা নেই, জানা নেই কি করে চিঠি পত্র লিখতে হয়, সহজেই সে নিখোঁজ হয়ে যাবে, গোঁসাই নিখোঁজ হয়ে যাবে—এমন কথা শোনার পর আর কে চায় দেশের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে। পিসি তার কত ভাল চায়, এমন কথার পর আর অবিশ্বাসটা থাকে কি করে! সে বলেছিল, পিসি আমার মাথাডার ঠিক নাই।

পিসি বলেছিল, তর-অ নাই নেতাইর-অ নাই। শেষে বলেছিল, সখারামের-অ নাই। তিন ক্ষ্যাপা নিয়া আমার হইছে মরণ!

সখারামের কথায় বাবলি একটু অবাক হয়ে গেল। বলল, তাঁর কথা ক্যান আসে!

—আসব না। তুই একখান কি মাইয়া ক'। তর জন্য মন পোড়ে।

—আমার লাইগা গরমেণ্টের মন পোড়ে পিসি!

—তা না ত কি! তর লাইগা এখন যত হুজ্জোতি পোহাইতে হইব। হাজত থাইকা ছাড়াইয়া আনা কি মুখের কথা। কত কাঠ পুড়ব দ্যাখলি। কত হয়রানি হয় দ্যাখ সখারামের!

—গরমেণ্টের-অ হয়রানি আছে?

—আছে না! পোকা থাকলেই মরণ। পোকায় কামড় দেয়। জ্বলে। জ্বলুনিতে খাক হইয়া যায়। দায় পড়ছে ক্যান! এই ঘা থাইকা জ্বলুনি হয়। তার উপশম চাই না। না হইলে তুই একখান কি মাইয়া কত ক' তর কষ্ট হইব জাইনাইত, সখারাম কইল, যত লাগে খরচ করমু।

তবু নিতাইরে জেলে পাঠাইতে দিমু না।

এরপর বাবলি আর সখারামকে ঘৃনা করে কি করে?
বাবলি যুবতী হয়ে উঠছে। মানুষের কত ইসছা হয়। সখারামের হইব বেশি কি সখারাম আর দেখতে তত কুৎসিৎ নয়। সখারামের কথাবার্তাও কিছুটা অভিভাবকের মত। তার বাবা কাকারা বাঁইচা থাকলেও বাবলির জন্য মন পুড়ত। এমন একখান মানুষ তার পক্ষ নিছে, ভাবতেই খুব সহজ হয়ে গেছিল বাবলি। সে গুণ গুণ করে গান গেয়েছে, বেহুলা জলে ভাইসা যায় রে ·· ·····!

বেহুলা জলে ভাইসা যায়—সেই জলে থাকে বিষহরি, ডাঙ্গায় থাকে বিষহরি, বেহুলা বসে থাকে কলার একখানা খোলে। গ্রাম মাঠ, ধূসর বনভূমি গুল্ম তার দু-পারে দাঁড়িয়ে। সে নিজের জীবনে এক বেহুলার মত গোঁসাইর জন্য অপেক্ষায় আছে। যমরাজের কাছে সে যাবে, তার ভোগের জন্য যা কিছু লাগে, যদি দেহখানা দিতে হয় তাও সে রাজি। শনে বাড়ি ফিরে দেখেছিল, ঘর নিকানো নিবিড়ে একেবারে সত্যলক্ষ্মীর মত বাবলি দোরে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

এইভাবে এক জীবন, তার পরানের ধন যায় না ফেলা এমন এক মন নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে দেখল ঝুম ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। ঝাপসা বৃষ্টিতে গাছপালা ছেয়ে গেছে। ধূসর হয়ে গেছে সামনের শস্য ক্ষেত। নিচে জোয়ারে জল উঠে আসছে। কুপি জ্বলছে। দাওয়ায়। কেউ গড়াচ্ছে। টেঁউ টেঁউ করে কাঁদছে এক মনিষ্যি। সে মাঝে মাঝেই বলছে, তোমার বাবা গেছে জোয়ারের জলে মাছ ধরতে। এই এল বলে। এবং সে দেখতে পায়, জোয়ান সাই এক মানুষ, এক কাঁধে কোচ, অন্য হাতে তাজা কয়খান সঁরপুটি ঝুলিয়ে ফিরছে। রাতে সরষে বাটা দিয়ে মাছের ঝাল। মানুষটা খেতে বসে ঝালে হা হু করছে আর আড়চোখে দেখছে। বাবলি তাকাতে পারছে না। তর সইছে না। —তর হাত বড় মিষ্টি মাইয়া। খাইলাম, যেন একখান অমৃত খাইলাম।

এই করে বাবলি একদিন দেখল, সখারাম আবার আসছে। সাঁজ বেলা। সখারাম আসতেই জলচকি বের করে দিল বাবলি। শনে পিসি বলেছে, বামুন মানুষ, এলেই পা ধরে পুণ্যি চাইবি। বাবলি পুণ্যি চাইল। সখারাম বলল, ভাল আছিস।

বাবলি বলল, হ আছি

—আর কটা দিন সবুর ক। কালই শেষ

—কি শেষ।

—নোটিশের দিন শেষ।

—তারপরে কি হইবে গরমেণ্ট।

—আগুন জ্বলব। ধৈর্যের সীমা আছে সবার।

শনে পিসি চা করছে সখারামের জন্য। রান্না ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, নাল উঠল না।

—না উঠব না কয়। চা হল। বসতে পারব না! কাজ কত পড়ে আছে। বাবলির দিকে আড়চোখে তাকায়। বাবলিকে দেখে বুঝতে পারে ফোঁস কমে গেছে অনেক। বাবলি তাকে দেখলে মিস্টি হাসে। এই ভাবে করাত চালাতে পারলে, হ্যাঁ একখানা ষোড়ষী যুবতী, এখনত আর বাপ ঠাকুরদার মত সেই স্বাদ পাবার কোন রাস্তা নেই। রাস্তা করে নিতে হয়। আগের জমানাই ছিল বড় সুস্বাদু। দেবী তার নিজের ঘরে এল বেশ বয়সে। নারীও ছুড়ি পার হলেই বুড়ি। তাজা মাগী থাকে না। ডিম পাড়া মুরগী হয়ে যায়। এই করে সংসার মানুষের।. সখারাম মনে মনে আইনের গেজ পুড়ি বলল। শনে পিসি চা দিলে বলল, তোমরা সাবধানে থেক। বাবলিকে বলল, হুট হাট মাঠে চলে যাস না। কারণ পালাচ্ছে কেউ কেউ। পুলিশ ধরে আনছে। ঠেলাঠেলি করে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তোকে নিয়ে আমার বড় ভয়। এই বলেই আবার সাইকেলে চেপে উধাও হয়ে গেল। এই কথায়ও চোখ টান করে মিস্টি হাসল বাবলি।

সুতরাং বাবলি আর ঘর থেকে বের হল না। পরদিন দেখল এক

াও কালো মেঘ ভেসে আসছে। সে ডাকল অ পিসি দ্যাইখা' যাও,
্যাঘ কারে কয় দেইখা যাও। শুনে পিসি বাইরে এসেই বুঝল আগুন
দিয়েছে সখারাম। ঘরবাড়ি পুড়ছে। আগুনের লেলিহান জিহ্বা আকাশ
ুয়ে দিল। উত্তরের আকাশটা লাল হয়ে গেলে বুঝতে পারল বাবলি,
গোঁসাইর ঘর বাড়ি পুড়ে যাচ্ছে। তার ছিল একখানা পিতৃপুরুষের
কাচ। গোঁসাইর ইজ্জত বলতে [illegible]। সেই ইজ্জতও পুড়ে
গেল আজ। বাবলি বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে আছে। গোঁসাই ফিরে
লে তাকে কি ফেরত দেবে আজ আর সে জানে না।